দেশী মুরগি পালন নির্দেশিকা

দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

দেশী মুরগি পালন নির্দেশিকা

সম্পাদনায়

ড. শাকিলা ফারুক

প্রকল্প পরিচালক

দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

পৃষ্ঠপোষকতায়

ড. নাথু রাম সরকার

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

জুন-২০১৮

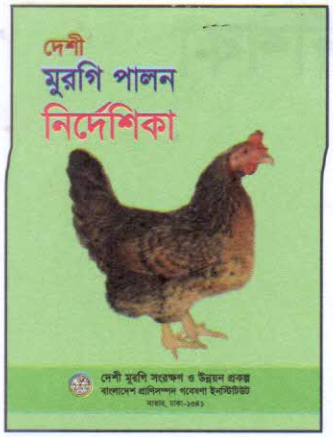

দেশী মুরগি পালন নির্দেশিকা

বিএলআরআই প্রকাশনা নং-২৯৬
প্রথম সংস্করণ প্রকাশকাল : জুন-২০১৮ খ্রি:
মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশনায় :
প্রকল্প পরিচালক
দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১।

ই-মেইল : infoblri@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.blri.gov.bd

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। বর্তমানে কৃষির পাশাপাশি বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। কর্মক্ষম নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নিরাপদ খাদ্য যোগান ও পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে পোল্ট্রি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাণিজ্যিক ও গ্রামীণ এ দুই ধারায় পোল্ট্রি উৎপাদন ব্যবস্থা দেশে চলমান রয়েছে। অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও বর্তমানে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বড় আকারের অনেক বাণিজ্যিক খামার গড়ে উঠেছে। তবে লেয়ার ও ব্রয়লার শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত বাণিজ্যিক পোল্ট্রীর শিল্প এখনও আমদানি নির্ভর জাতের উপর নির্ভরশীল। এসব দিক বিবেচনা করে সরকারের নীতি নির্ধারকগণ বাণিজ্যিক মুরগি পালনের পাশাপাশি দেশী মুরগি পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং দেশী মুরগির জাত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে দেশী মুরগি পালনকে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ হতে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিএলআরআই) **"দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন"** শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহকে বাস্তবায়ন করার জন্য বিএলআরআই তিনটি দেশীয় জাতের মুরগিকে বিগত ২০০০ সাল হতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেক্টিভ ব্রীডিং এর মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল জাতে উন্নিত করেছে। এসব দেশী মুরগি বর্তমানে অধিক ডিম উৎপাদনে সক্ষম এবং ডিমের ওজনও অন্যান্য প্রচলিত দেশী মুরগির ডিম থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি। উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম দেশের ৬টি এলাকায় ক্ষুদ্র খামারীদের মাঝে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশী মুরগির উৎপাদন দক্ষতা যাচাই ও সম্প্রসারণের প্রাথমিক কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং খামারীরা লাভবান হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে দেশী মুরগি পালনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে, দেশী মুরগির খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাসহ জীব-নিরাপত্তা অনুসরণে লালন-পালনের নির্দেশনা সম্বলিত একটি নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ তৈরী করেছেন, যা ব্যবহারে খামারীগণ সহজেই দেশী মুরগি লালন-পালন করতে পারবেন। তাছাড়াও সৌখিনভাবে যারা বাড়ির ছাদে কিংবা অন্য কোন জায়গায় দেশী মুরগি পালন করতে ইচ্ছুক তারাও নির্দেশিকাটি পড়ে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

নির্দেশিকাটি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. নাথু রাম সরকার
মহাপরিচালক (অঃ দাঃ)

দেশী মুরগি পালন নির্দেশিকাটিতে মোট ১৫ টি অধ্যায় রয়েছে, যা রচনা করেছেন -

ক্র.নং	লেখক	অধ্যায়
১।	ড. শাকিলা ফারুক (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	প্রথম অধ্যায়
২।	ড. শাকিলা ফারুক (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	দ্বিতীয় অধ্যায়
৩।	ড. শাকিলা ফারুক (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	তৃতীয় অধ্যায়
৪।	হালিমা খাতুন (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	চতুর্থ অধ্যায়
৫।	হালিমা খাতুন (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	পঞ্চম অধ্যায়
৬।	মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	ষষ্ঠ অধ্যায়
৭।	মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	সপ্তম অধ্যায়
৮।	ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	অষ্টম অধ্যায়
৯।	ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	নবম অধ্যায়
১০।	ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন (প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	দশম অধ্যায়
১১।	ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	একাদশ অধ্যায়
১২।	ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	দ্বাদশ অধ্যায়
১৩।	ড. শাকিলা ফারুক (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	ত্রয়োদশ অধ্যায়
১৪।	হালিমা খাতুন (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	চতুর্দশ অধ্যায়
১৫।	মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)	পঞ্চদশ অধ্যায়

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম	**দেশী মুরগি** ➢ ভূমিকা ➢ ক্ষুদ্র খামারে দেশী মুরগি পালনের উদ্দেশ্য ➢ দেশী মুরগির খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমূহ ➢ এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য	০৭-০৮
দ্বিতীয়	**দেশী মুরগির জাত পরিচিতি** ➢ সাধারণ দেশী ➢ হিলি ➢ গলাছিলা ➢ আছিল ➢ জঙ্গল ফাউল ➢ ইয়াছিন ➢ দেশী ডোয়ার্ফ	০৯-১২
তৃতীয়	**দেশী মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা** ➢ ব্রুডিং কি? ➢ ব্রুডিং এর উদ্দেশ্য ➢ ব্রুডিং হাউজের পূর্ব প্রস্তুতি ➢ ব্রুডিং কালীন ব্যবস্থাপনা/ ব্রুডিং এর প্রস্তুতি ➢ ব্রুডিং এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ➢ তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার ব্যবস্থাপনা ➢ আলোক ব্যবস্থাপনা ➢ বায়ু চলাচল ব্যবস্থাপনা ➢ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ➢ পানি ব্যবস্থাপনা ➢ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	১৩-১৮
চতুর্থ	**বাড়ন্ত দেশী মুরগির ব্যবস্থাপনা** ➢ বাড়ন্ত কালীন সময় বা গ্রোয়িং পিরিয়ড ➢ আলোক ব্যবস্থাপনা ➢ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ➢ পানি ব্যবস্থাপনা ➢ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ➢ বাড়ন্ত মুরগি পালনে অবশ্য করণীয় কাজ	১৯-২১
পঞ্চম	**ডিম পাড়া দেশী মুরগীর ব্যবস্থাপনা** ➢ ডিম পাড়া মুরগী বাছাই ➢ মুরগীর ঘরের তাপমাত্রা ➢ ডিম পাড়া মুরগীর খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা ➢ আলোক ব্যবস্থাপনা ➢ ডিম পাড়া মুরগীর টিকাদান কর্মসূচী ➢ ডিম পাড়ার বাসা ➢ মেঝেতে ডিম পাড়া ➢ লিটার ব্যবস্থাপনা	২২-২৮

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ষষ্ঠ	**স্বল্প খরচে ঘর নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনা** ➢ ছয়টি মুরগী এবং একটি মোরগ পালন উপযোগী ঘরের বর্ণনা ➢ ঘরের বর্ণনা (বিভিন্ন পদ্ধতি) ➢ মুরগির ঘরের স্থান নির্বাচন ➢ বাণিজ্যিকভাবে দেশী জাতের মুরগি পালন উপযোগী ঘরের বর্ণনা	২৯-৩১
সপ্তম	**মুরগির ঠোঁট কাটা বা ডিবিকিং** ➢ ঠোঁট কাটা বা ডিবিকিং ➢ ডিবিকিং বা ঠোঁট কাটার উদ্দেশ্য ➢ ঠোঁট কাটার সময় ➢ ঠোঁট কাটার পদ্ধতি ➢ ঠোঁট কাটার অনুপযুক্ত সময় ➢ ঠোঁট কাটার সময় সতর্কতা অবলম্বন ➢ ঠোঁট কাটার পরবর্তী পরিচর্যা	৩২-৩৩
অষ্টম	**হঠাৎ ডিম উৎপাদন ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণ এবং প্রতিকারের উপায়**	৩৪-৩৬
নবম	**মুরগিতে লক্ষণীয় বদ অভ্যাস সমূহ, মুরগির বদ অভ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব, কারণ ও প্রতিকারের উপায়**	৩৭-৩৯
দশম	**মুরগির খামারের জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা** ➢ জীব-নিরাপত্তা ➢ জীব-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ সমূহ ➢ জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা	৪০-৪১
একাদশ	**মুরগির ভ্যাক্সিন ও তার ব্যবহারবিধি** ➢ ভ্যাক্সিন বা টীকা ➢ ভ্যাক্সিনেশনের সাধারণ নিয়মসমূহ ➢ ভ্যাক্সিন বা টীকা দেওয়ার পরে রোগের কারণ ➢ ভ্যাক্সিন প্রদানের পদ্ধতি ➢ একক ভ্যাক্সিন প্রদান পদ্ধতি ➢ দলগত ভ্যাক্সিন প্রদান পদ্ধতি ➢ ভ্যাক্সিন সংরক্ষণ ➢ সাবধানতা	৪২-৪৫
দ্বাদশ	**মুরগির গুরুত্বপূর্ণ রোগ সমূহ ও তার ব্যবস্থাপনা** ➢ বিভিন্ন অনুজীব দ্বারা সৃষ্ট মুরগির বিভিন্ন রোগের তালিকা ➢ মুরগির সাধারণ রোগসমূহের কারণ, লক্ষণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা	৪৬-৪৭
ত্রয়োদশ	**মুরগির প্রজনন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো পদ্ধতি** ➢ মুরগির প্রজনন ➢ উর্বর ডিম উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ➢ বাচ্চা ফুটানো ডিমের বৈশিষ্ট্য ➢ বাচ্চা ফুটানো ডিমের যত্ন ➢ হ্যাচিং ডিম জীবাণুমুক্তকরণ ➢ বাচ্চা ফুটানো ডিম ও খাওয়ার ডিম সংরক্ষণ ➢ ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো পদ্ধতি	৪৮-৫২
চতুর্দশ	**রেশন তৈরীকরণ** ➢ দেশী মুরগির বাচ্চার (০-৮ সপ্তাহ) রেশন তৈরীকরণ ➢ দেশী মুরগির বাড়ন্ত বাচ্চার (৯-১৬ সপ্তাহ) রেশন তৈরীকরণ ➢ দেশী মুরগির লেয়ার (১৭-৭২ সপ্তাহ) রেশন তৈরীকরণ	৫৩-৫৫
পঞ্চদশ	**দেশী মুরগির খামারে আয়-ব্যয়ের হিসাব** ➢ ৮ টি দেশী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব ➢ ১০০০ টি দেশী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব	৫৬-৫৮

প্রথম অধ্যায়

দেশী মুরগি

ভূমিকা

জনবহুল এ দেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ পালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমিষের উৎস হিসেবে হাঁস-মুরগি হতে প্রাপ্ত ডিম ও মাংস একদিকে মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টিহীনতা রোধ করছে, অন্যদিকে কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, জৈবসার সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। বিভিন্ন সূত্র মতে, প্রায় ৬০ লক্ষাধিক মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এই শিল্প। দেশী জাতের হাঁস-মুরগি লালন পালন করা বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য। গ্রাম বাংলার বেশির ভাগ ঘরেই অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক-পারিবারিক অনুষ্ঠানে গৃহপালিত পোষা হাঁস-মুরগি উপহার দেওয়ার রেওয়াজ আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি। দরিদ্র পরিবারের নিজস্ব সম্পদ বলতে শুধু হাঁস-মুরগিই বোঝাত। খেটে খাওয়া পরিবারের মহিলাদের দুঃসময়ের সহায় ছিল এসব হাঁস-মুরগি; যেগুলো সাধারণত কোনরূপ পরিচর্যা ছাড়াই ও গৃহস্থালীর উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়েই লালন পালন করা হতো। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পেও এসেছে নানা পরিবর্তন। মূলতঃ ষাটের দশকে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি শিল্পের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর সাথে সাথে এ শিল্পের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিজ্ঞানভিত্তিক লালন-পালন এদেশে পোল্ট্রি শিল্পে বয়ে এনেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। বর্তমানে পোল্ট্রি শিল্পে বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকারও অধিক টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্টদের দাবী। এছাড়াও, ১ কোটির উপরে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এই শিল্প যা বর্তমানে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক। পোল্ট্রি সেক্টরের এই অভাবনীয় পরিবর্তনের পেছনে বিদেশ থেকে আমদানি করা উন্নত জাতের মুরগি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে, বাণিজ্যিক পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের কারণে আমাদের দেশীয় জাতের হাঁস-মুরগির উন্নয়ন হয়নি। বরং, বিদেশী জাতগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত ক্রসিং-এর কারণে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আমাদের দেশীয় জাতের হাঁস-মুরগি গুলোর অস্তিত্ব আজ চরম সংকটাপূর্ণ। দেশীয় জাতের এসব হাঁস, মোরগ-মুরগীর মাংস ও ডিমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকলেও এগুলোর উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ ইতিপূর্বে নেওয়া হয়নি। রাজধানী ঢাকার সাভারস্থ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) সৃষ্টি লগ্ন থেকেই প্রাণিসম্পদ ও মোরগ-মুরগীর উন্নয়নের নিমিত্তে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যা দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগীর বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

ক্ষুদ্র খামারে দেশী মুরগি পালনের উদ্দেশ্য

- দুঃস্থ, কর্মহীন ও বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা
- পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা
- দেশী মুরগী হতে ডিম এবং ডিম পাড়া মুরগী বাজারে বিক্রি করে বাড়তি অর্থ দিয়ে জীবন যাত্রার মান উন্নত করা
- খামারীরা ঘরে বসেই স্বল্প পুঁজি খাটিয়ে অধিক লাভবান হতে পারে

দেশী মুরগির খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমূহ

- খামার তৈরীর জন্য নির্বাচিত স্থান লোকালয় বা আবাসিক ঘন বসতি এলাকা হতে দূরে শুষ্ক, উঁচু, সুষ্ঠু পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন স্থান হতে হবে
- যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে
- পর্যাপ্ত আলো এবং বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকতে হবে
- আশে পাশে পঁচা ডোবা ও নর্দমামুক্ত হতে হবে
- বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে

এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

কৃষি নির্ভর অর্থনীতির বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উল্লেখযোগ্য একটি খাত যেটির গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর অন্যতম উপখাত-পোল্ট্রি, দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান-প্রাণিজ আমিষসহ অন্যান্য পুষ্টির চাহিদা পুরণে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে বাণিজ্যিক মুরগি পালনের আশাতীত প্রসার ঘটলেও দেশী মুরগির ক্ষেত্রে তেমন প্রসার ঘটেনি, এমনকি এর উন্নতির কোন পদক্ষেপও ইতিপূর্বে গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সৃষ্টি লগ্ন থেকেই প্রাণিসম্পদ ও মোরগ-মুরগীর উন্নয়নের নিমিত্তে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। "দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" প্রকল্প এমন প্রচেষ্টার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস যা দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগীর বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য এই মূল্যবান প্রাণিজসম্পদ উৎপাদনে প্রযুক্তিগত জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। এই অভাব পূরণের লক্ষ্যেই দেশী মুরগি পালন নির্দেশিকা প্রনীত। এর মাধ্যমে খামারী, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মী, উদ্যোক্তা সবাই উপকৃত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেশী মুরগির জাত পরিচিতি

জাত ঃ সাধারণ দেশী

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। সচরাচর যে সকল মোরগ-মুরগী গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে দেখা যায়, তার প্রায় সবই এই জাতের অন্তর্ভূক্ত।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মোরগ-মুরগী নির্দিষ্ট কোন রং এর অন্তর্ভূক্ত হয় না। তথাপি পর্যায়ক্রমে নিয়মতান্ত্রিক বাছাই/সিলেকশনের মাধ্যমে লালচে বাদামী বা লালচে কালো রঙের মুরগিই বর্তমানে সংখ্যায় বেশী পাওয়া যায়। তবে কালো এবং সোনালী রঙের মুরগিও আছে। এদের পা লোমহীন ও পায়ের নলা সাদাটে তবে কালো রঙের নলাও দেখা যায়। চামড়া হলদে। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রং লাল। তবে বাদামী বা ধূসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি বেশী দেখা যায়। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগের ওজন ১.৫০-২.৫০ কেজি এবং মুরগীর গড় ওজন ১.২০-২.০০ কেজি। বৎসরে গড়ে প্রতিটা মুরগী ১৫০-১৬০ টি ডিম দেয়। প্রতিটা ডিমের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। ডিমের রং হালকা সাদা থেকে গাঢ় বাদামী। মুরগী ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। তবে ইনটেনসিভ সিস্টেম বা আবদ্ধ অবস্থায় পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৭৫-৮০ গ্রাম খাবার খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

দেশী মোরগ

দেশী মুরগী

জাত ঃ হিলি

প্রাপ্তি স্থান ঃ চট্টগ্রাম এলাকা বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি অঞ্চলেও এই মুরগি পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ সাদার মধ্যে কালো ছিটা যুক্ত রঙের হিলি মুরগি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তবে ধূসর এবং লালচে মুরগিও দেখা যায়। এ জাতের মুরগি সাধারণত দেশী মুরগির চেয়ে বৃহদাকার হয়। পালকহীন পা ও হলদে চামড়া এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রঙ লাল। তবে বাদামী এবং ধূসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। কানের লতি সাদা তবে লাল এবং সাদার মিশ্রণ যুক্ত লতিও দেখা যায়। পায়ের নলা সাদাটে তবে হলুদ এবং কালো রঙের নলাও দেখা যায়। মোরগ-মুরগীর গড় ওজন যথাক্রমে ২.০০-৩.৫০ এবং ১.৫-২.০০ কেজি। বাৎসরিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১৩০-১৪০ টি। প্রতিটি ডিমের গড় ওজন ৪০-৪২ গ্রাম। ডিমের রঙ হালকা বাদামী। মুরগী ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। তবে আবদ্ধ অবস্থায় বা খাঁচায় দীর্ঘদিন পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৮৫-৯০ গ্রাম খাবার খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

হিলি মোরগ

হিলি মুরগী

জাত ঃ গলাছিলা

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের প্রত্যেক এলাকায় কম-বেশী পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ গলায় কোন লোম না থাকা এই জাতের মুরগির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরা বিভিন্ন রঙের পালকের হয়ে থাকে। তবে কালো এবং লালচে কালো বেশি গোচরীভূত হয়। লোমহীন পা, হলদে চামড়া এবং একক ঝুঁটি বিশিষ্ট হয়। ঝুঁটির রঙ বেশির ভাগ লাল বা বাদামী। কানের লতি লাল। তবে লাল ও সাদা মিশ্রণ যুক্ত লতিও দেখা যায়। পায়ের নলা বেশির ভাগ হলুদ। তবে সাদা এবং কালো রঙের পায়ের নলাও দেখা যায়। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগের ওজন ১.৫০-২.৫০ কেজি এবং মুরগীর গড় ওজন ১.২০-২.০০ কেজি। বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ১৭০-১৮০ টি। প্রতিটি ডিমের গড় ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। ডিমের রঙ হালকা বাদামী। মুরগী ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। তবে আবদ্ধ অবস্থায় বা খাঁচায় দীর্ঘদিন পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৭৫-৮০ গ্রাম খাবার খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

গলাছিলা মোরগ

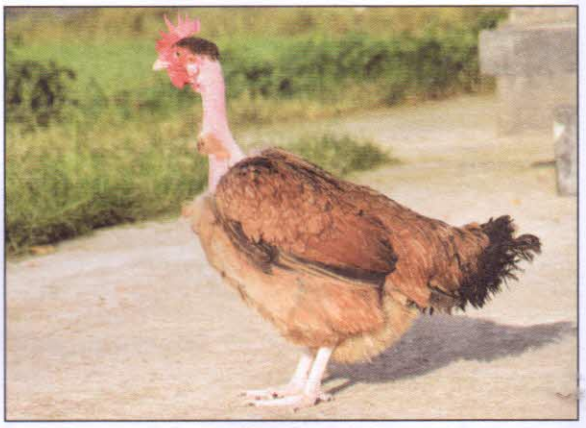

গলাছিলা মুরগী

জাত ঃ আসিল

প্রাপ্তি স্থানঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল এলাকায় পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্যঃ গাঢ় খয়েরী রঙের পালক দেখা যায়। লোমবিহীন পা অপেক্ষাকৃত অন্য দেশী জাতের মুরগির চেয়ে লম্বা। নিবিড় পালন পদ্ধতিতে ইহার বংশবৃদ্ধি ভাল হয় না। মাংস উৎপাদনকারী জাতের উৎস হিসেবে পরিচিত।

বৎসরে গড়ে ৩০-৩৫ টি ডিম দেয়। ডিমের গড় ওজন ৪৫ গ্রাম। মুরগী ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। মোরগ লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত। প্রতিটি মোরগ-মুরগীর গড় ওজন যথাক্রমে ২.৫০-৪.০০ এবং ১.৭০-২.৫০ কেজি। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ঋতুভেদে ৮-১০ মাস। প্রতিটি মুরগি গড়ে প্রতিদিন ১৩০ গ্রাম খাবার খায়। রোগ-বালাই কম হয়।

আসিল মোরগ

আসিল মুরগী

জাত ঃ জঙ্গল ফাউল

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকায় বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ জঙ্গল ফাউল মোরগ-মুরগী বিভিন্ন রঙের পালকের হয়ে থাকে। মোরগগুলো সাধারণত লাল কালো এবং সোনালী রংয়ের মিশ্রণযুক্ত হয় এবং মুরগীগুলো সাধারণত সবুজ বাদামী ও কালো মিশ্রণযুক্ত হয়। লোমহীন পা, কালো চামড়া এবং একক ঝুঁটি বিশিষ্ট হয়। ঝুঁটির রঙ বেশির ভাগ লাল বা বাদামী। কানের লতি লাল ও সাদা মিশ্রণযুক্ত । তবে শুধু লাল লতিও দেখা যায়। পায়ের নলা কালো। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগের গড় ওজন ১.০-১.২ কেজি এবং মুরগীর গড় ওজন ০.৮-১.০ কেজি। বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ৬০-৮০ টি। প্রতিটি ডিমের গড় ওজন ৩০-৩৫ গ্রাম। ডিমের রঙ হালকা বাদামী। মুরগী ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। তবে আবদ্ধ অবস্থায় বা খাঁচায় দীর্ঘদিন পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৬০-৬৫ গ্রাম খাবার খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

জঙ্গল ফাউল মোরগ

জঙ্গল ফাউল মুরগী

উৎসঃ মোঃ আশাদুল আলম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিককেন্দ্র, বিএলআরআই

জাত ঃ ইয়াছিন

প্রাপ্তি স্থান ঃ পার্বত্য এলাকায় বিশেষ করে বান্দরবান এবং টেকনাফে পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ হালকা সোনালী লালচে রঙের মুরগি সচরাচর দেখা যায়। মোরগগুলো লড়াইয়ের জন্য বেশ উপযুক্ত। গলাছিলা ও হিলির তুলনায় অনেক কম ডিম পাড়ে। প্রতিটা ডিমের গড় ওজন ৪৪ গ্রাম। ডিমের রঙ হালকা বাদামী। মুরগী ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। প্রাপ্ত বয়স্ক একটি মোরগের গড় ওজন ২.০০-৩.৫০ কেজি এবং একটি মুরগীর গড় ওজন ১.৫০-২.২৫ কেজি। একটি মুরগি গড়ে প্রতিদিন ১২০-১২৫ গ্রাম সুষম খাবার খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ঋতু ভেদে ৭-৮ মাস।

ইয়াছিন মোরগ

ইয়াছিন মুরগী

জাত ঃ দেশী ডোয়ার্ফ

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ মোরগ-মুরগীর মধ্যে বৈচিত্র্যময় পালক দৃষ্টি গোচর হয়। অনেক রঙের মধ্যে লাল রঙের মোরগ বেশী দেখা যায় এবং আকর্ষণীয়। মুরগীর মধ্যে হালকা লাল-মেটে রঙ প্রধান। প্রতিটি মুরগির দৈনিক গড় খাদ্য গ্রহণ ৮০ গ্রাম। এই জাতীয় মুরগির পা এর নলা (Shank) অপেক্ষাকৃত খাট যা সহজে অন্যান্য সাধারণ মুরগির থেকে আলাদা করা যায়। বয়স্ক মুরগীর দৈহিক গড় ওজন ১.২৮ কেজি এবং মোরগের গড় দৈহিক ওজন ১.৬০ কেজি। বাৎসরিক গড় ডিম উৎপাদন ১২১ টি এবং প্রতিটা ডিমের গড় ওজন ৩৯ গ্রাম।

দেশী ডোয়ার্ফ মোরগ

দেশী ডোয়ার্ফ মুরগী

তৃতীয় অধ্যায়

দেশী মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডিং কী?

ব্রুডিং শব্দটি জার্মান শব্দ ব্রুড থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে তাপ দেওয়া। বাচ্চা ফোটার পর থেকে ১-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বাচ্চাকে কৃত্রিম ভাবে তাপ দ্বারা লালন-পালন করাকে ব্রুডিং বলা হয়। ব্রুডিং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ। তাই ব্রুডিং-এ অবশ্যই সঠিক তাপমাত্রা (৩২-৩৫° সেঃ অথবা ৯০-৯৫° ফাঃ) নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং বাচ্চা যে স্থানে থাকে সেই স্থানে ঐ নির্দিষ্ট তাপমাত্রা প্রদান করতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ঐ তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে। বাচ্চাকে মেঝেতে ব্রুডিং করতে হলে ঘরের মেঝে পাকা ও শুষ্ক হওয়া বাঞ্চনীয়। বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার পূর্বে খাদ্যের পাত্র, পানির পাত্র ও ব্রুডার সঠিক স্থানে স্থাপন করতে হবে। বাচ্চাকে একটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে রাখার জন্য হার্ড বোর্ডের চিক গার্ড এর ব্যবস্থা করতে হবে। চিক গার্ডের উচ্চতা ১ থেকে ১.৫ ফিট হওয়া বাঞ্চনীয়। ৭-৮ ফুট ব্যাসের একটি চিক গার্ড দ্বারা ৩০০-৪০০ টি বাচ্চা প্রারম্ভিক সময়ে ব্রুডিং করা যেতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে গার্ডের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। ৩-৪ সপ্তাহ পর চিক গার্ড উঠিয়ে বাচ্চা সমস্ত ঘরে ছেড়ে দিতে হবে।

ব্রুডিং এর উদ্দেশ্য

মুরগি পালনে ব্রুডিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ এই সময় বাচ্চা লালন-পালন যদি ভাল হয় তবে সারা বৎসর সেই মুরগি থেকে ভাল উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। সঠিক ভাবে ব্রুডিং করলে নিম্নোলিখিত ফল পাওয়া যায়ঃ

- ঠান্ডা, গরম, বৃষ্টি প্রতিকূল আবহাওয়া ইত্যাদি থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করা
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে
- ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়
- সমস্ত বাচ্চা সমানভাবে বাড়তে থাকে, বাচ্চা ছোট বড় হয় না
- সঠিক শারীরিক গঠন হয়
- বংশগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে
- বিভিন্ন পীড়ন থেকে সুরক্ষিত থাকে
- বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে রক্ষা করা যায়

ব্রুডিং হাউসের পূর্ব প্রস্তুতি

বাচ্চা ব্রুডিং করার জন্য ঘরে উঠানোর পূর্বে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এজন্য নিম্নের কাজগুলো করতে হবেঃ

- সমস্ত পুরাতন লিটার ভালভাবে পরিষ্কার করে ফার্ম থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে
- ঘরের পর্দা এবং ভিতরে ও বাইরে মাকড়সার জাল থাকলে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে
- পর্দা, ঘর, খাবারের পাত্র, পানির পাত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভালভাবে ধৌত করার পর জীবাণুনাশক দ্বারা ভালভাবে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে
- দুই থেকে তিন বার ঘর ধৌত করার ব্যবস্থা করতে হবে
- ঘরের কোথাও ভাঙ্গা বা ফাটল থাকলে তা মেরামত করে নিতে হবে এবং ঘর ধোয়ার পর তাতে ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে
- ঘরের চারিপার্শ্বে ৫-৬ ফুট পরিমাণ জায়গায় ঘাস কেটে পরিষ্কার করতে হবে এবং পুরাতন মুরগির ময়লা

থাকলে তা পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে

- ঘরের ভিতরে ও বাইরে ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর কয়েকদিন পর ফরমালিন স্প্রে করতে হবে
- বাচ্চা উঠানোর ৬ দিন পূর্বে বাচ্চার সমস্ত জিনিসপত্র আবার জীবাণুমুক্ত করে শুষ্ক করে ভিতরে রাখতে হবে
- বাচ্চা ব্রুডিং এর একদিন পূর্বে ব্রুডারে তুষ বিছাতে হবে এবং ব্রডস্পেক্ট্রাম জীবাণুনাশক দ্বারা স্প্রে করে নিতে হবে
- বাচ্চা ব্রুডিং করার কয়েকদিন পূর্ব থেকেই ঘরের ফুটবাথে জীবাণুনাশক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে
- বাচ্চা উঠানোর পর প্রতিদিন একবার করে ঘরের বাহিরের চারিদিক ৫% ফরমালিন দ্বারা স্প্রে করতে হবে

ব্রুডিং এর প্রস্তুতি

- বাচ্চা উঠানোর ১ দিন পূর্বে লিটার বিছিয়ে গরম করার ব্যবস্থা করতে হবে
- ঘরের পর্দার উপরের অংশ অবস্থা বুঝে ৬" বা ১২" পরিমাণ খোলা রাখতে হবে
- লিটারের উপর পাটের চট বা কাগজ বিছিয়ে দিতে হবে
- চিক গার্ড গোলাকার তৈরী করতে হবে, তা না হলে বাচ্চা একদিকে থাকবে
- হোভার গোলাকার চিক গার্ডের মাঝখানে রাখতে হবে
- ব্রুডারে বাচ্চা ছাড়ার ৬ ঘন্টা পূর্বে উপযুক্ত তাপমাত্রা অর্থাৎ ৩৫° সেঃ বা ৯৫° ফাঃ এ আনতে হবে এবং ২-৩ ঘন্টা পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ২৫ গ্রাম গ্লুকোজ ভালভাবে মিশিয়ে হোভার থেকে দূরে সাজিয়ে দিতে হবে
- বাচ্চা বেশি দূর থেকে আনা হলে ব্রুডারে ছাড়ার পূর্বে গ্লুকোজের পানিতে ঠোঁট চুবিয়ে নিতে হবে। কারণ বাচ্চা ফোটার পর প্রতি ১ ঘন্টার জন্য ০.১ গ্রাম করে ওজন হারাতে থাকে। তাই এই সময়ে তাড়াতাড়ি গ্লুকোজের পানির সহিত পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে বাচ্চাগুলো তাড়াতাড়ি গ্লুকোজ মিশ্রিত পানি খায়

ব্রুডিং এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

দেশী মুরগির ঘরে ব্রুডিং কালীন ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির তালিকা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ব্রুডার ঃ

মুরগির বাচ্চা কৃত্রিমভাবে তাপ দিয়ে পালন করার জন্য ব্রুডার ব্যবহার করা হয়। ব্রুডারের তিনটি অংশ থাকে। যেমনঃ হোভার, ব্রুডার গার্ড, ব্রুডার হিটার।

ক) হোভার ঃ ব্রুডারের ছাতার মত অংশকে হোভার বলা হয়।

প্রয়োজনীয়তা ঃ ব্রুডারের সৃষ্ট তাপ বাচ্চার দিকে নিম্নমুখী করার জন্য হোভার ব্যবহার করা হয়।

পরিমাপ ঃ হোভার ৩ ফুট হতে ৮ ফুট ব্যাসযুক্ত হতে পারে। ৩ ফুট ব্যাসযুক্ত হোভারের নিচে ১৫০-২০০ টি বাচ্চা রাখা হয়।

খ) ব্রুডার গার্ড/চিকগার্ড ঃ হোভারকে কেন্দ্র করে ব্রুডার গার্ড/চিক গার্ড স্থাপন করা হয়।

প্রয়োজনীয়তা ঃ ব্রুডারগার্ড বা চিকগার্ড বাচ্চাদের তাপের উৎসের কাছাকাছি রাখতে সাহায্য করে।

পরিমাপ ঃ সাধারণত হোভারের ২ বা ৩ ফুট দূরত্বে তারের জালের বেষ্টনী তৈরী করা হয়, ফলে বাচ্চা দূরে যেতে পারে না। ৯-১০ ফুট ব্যাসের একটি ব্রুডার গার্ড বা চিকগার্ডে ৩০০-৪০০ টি বাচ্চাকে প্রাথমিক অবস্থায় ব্রুডিং করা যেতে পারে।

ব্রুডার হিটারের প্রকারভেদ

- বৈদ্যুতিক হিটার
- কেরোসিন হিটার
- গ্যাস হিটার
- ব্যাটারী হিটার

অন্যান্য যন্ত্রপাতি

- পানির পাত্র
- খাবারের পাত্র
- থার্মোমিটার
- হাইগ্রোমিটার
- খাদ্য পরিবেশন সামগ্রী- বালতি, মগ, বেলচা, খাদ্য পরিমাপক যন্ত্র, খাদ্য পরিবহন ট্রলি ইত্যাদি।
- মুরগি পরিমাপক যন্ত্র
- মুরগি স্থানান্তর করার খাঁচা
- স্প্রেয়ার
- খাদ্য মেশানোর মেশিন
- খাদ্য ভাঙ্গার মেশিন
- ভ্যান গাড়ি
- লিটার সামগ্রী- তুষ, কাঁঠের গুড়া, ধান, গমের খড়, কাগজ ইত্যাদি
- ফুটবাথে ব্যবহারের জন্য জীবাণুনাশক যেমন- পভিসেপ, এনটেক, ফিনাইল ইত্যাদি
- ঘর জীবাণুমুক্তকরণের জন্য জীবাণুনাশক যেমন- পভিসেপ, সেভলন, ব্লিচিং পাউডার এবং কষ্টিক সোডা ইত্যাদি।

তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার ঘরে প্রথম সপ্তাহে সাধারণত ৯৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা দিয়ে ব্রুডিং আরম্ভ করা হয় এবং এই তাপমাত্রা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে নিম্নলিখিত মাত্রায় রাখতে হবে। প্রথম সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর তাপমাত্রা ৫° ফাঃ করে কমিয়ে দিতে হবে এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে সপ্তাহে ৫° ফাঃ করে কমিয়ে তাপমাত্রা ৭৫° ফাঃ পর্যন্ত নামিয়ে আনতে হবে। বাচ্চার ঘরে বাতাসের আর্দ্রতা সারণী-১ অনুযায়ী থাকতে হবে। এতে বাচ্চা আরাম বোধ করবে।

সারণী-১: তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা

বয়স (দিন)	তাপমাত্রা		আর্দ্রতা (%)
	ডিগ্রী ফারেনহাইট	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	
০১-০৭	৯৫	৩৫	৫৫-৬০
০৮-১৪	৯০	৩২	৫৫-৬০
১৫-২১	৮৫	২৯	৫৫-৬০
২২-২৮	৮০	২৭	৫৫-৬০
২৯-৩৫	৭৫	২৪	৬০-৭০
৩৬-৪২	৭০	২১	৬০-৭০

সারণী-১ এ যে তাপের উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো ব্রুডারের তাপমাত্রা। হোভার ও চিক গার্ডের মাঝখানে মেঝে থেকে প্রায় ৬ ইঞ্চি উঁচুতে থার্মোমিটার ঝুলিয়ে এই তাপমাত্রা নিরূপন করা যায়। তবে থার্মোমিটার ছাড়াও ব্রুডারের তাপ সঠিক হয়েছে কিনা তা ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান এবং চলাফেরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝা যায়।

(ক) কাম্য তাপমাত্রা

ব্রুডিংকালীন সময়ে বাচ্চা যদি চিক গার্ডের ভিতরে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করে এবং খাদ্য ও পানি গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে তাপমাত্রা ঠিক আছে।

ব্রুডারে বাচ্চা স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করছে

(খ) অতি ঠান্ডা

ব্রুডারের নিচে তাপের উৎসের কাছে বা চিক গার্ডের ভিতরে যেকোন জায়গাতে বাচ্চা জড়ো হয়ে থাকলে বুঝতে হবে তাপমাত্রা কম আছে অর্থাৎ তাপ বাড়াতে হবে।

ব্রুডারে বাচ্চা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে

গ) অতিগরম

বাচ্চাসমূহ তাপের উৎস হতে দূরে গিয়ে চিক গার্ডের কাছাকাছি অবস্থান করে। মুখ হা করে হাঁপাতে থাকে। খাদ্য গ্রহণের প্রবনতা কমে যায় এবং পানি গ্রহণের মাত্রা বেড়ে যায় তখন বুঝতে হবে তাপমাত্রা বেশি আছে। তাপের উৎসের সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে। ঘর ঠান্ডা করার জন্য ঘরের বেড়ায় দেওয়া পর্দা তুলে দিতে হবে।

ব্রুডারে বাচ্চা তাপের উৎস থেকে দূরে সরে আছে

আলোক ব্যবস্থাপনা

প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪ টি বাল্ব ঝুলিয়ে দিতে হবে। প্রথম থেকেই প্রতিরাতে আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাদের অন্ধকারের সাথে পরিচিত করানো উচিত। তা না হলে রাতে হঠাৎ আলো বন্ধ হয়ে গেলে বাচ্চা ভয়ে জড়ো হয়ে পাইলিং (চাপাচাপি) করে মারা যেতে পারে।

বায়ু চলাচল ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার ঘরে বায়ু চলাচল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রুডার ঘরের দূষিত বায়ু নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন। তাপের উৎস হতে উদ্ভব কার্বন-মনো-অক্সাইড গ্যাস ও বাচ্চা কর্তৃক নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ধীরে ধীরে ব্রুডার ঘরে জমা হয়ে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া বাচ্চার মলমূত্র হতে সৃষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস বাচ্চার ঘরে দূর্গন্ধের সৃষ্টি করে। অল্প সময়ের জন্য পর্দা খুলে গ্যাস বের করে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা করা উচিত।

বায়ু চলাচলের উদ্দেশ্য

- বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের জন্য
- অতিরিক্ত আর্দ্রতা কমানোর জন্য
- কার্বন-মনো-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাস দূর করার জন্য

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ডিম হতে সদ্য ফুটন্ত বাচ্চার উদর গহ্বরে কুসুমটির কিছু অংশ থেকে যায় যা থেকে প্রথম ২-৩ দিন কোন খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই বাচ্চাগুলি বেঁচে থাকতে পারে। তবে ডিম হতে ফুটে বের হবার পর বাচ্চাকে দেরীতে খাদ্য ও পানি প্রদান করলে পরবর্তীতে দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং বাচ্চার মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। সেজন্য ডিম থেকে বাচ্চা ফুটার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাচ্চা পরিবহন করে খামারে আনতে হবে এবং বাচ্চাগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান

করার সুযোগ দিতে হবে। প্রথম ২-৩ দিন গ্লুকোজ এবং ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স মিশ্রিত পানি বাচ্চাগুলিকে পানি শূন্যতা প্রতিরোধে, পরিবহনজনিত ধকল কাটিয়ে উঠতে এবং সর্বোপরি তাদের খাদ্য পরিপাক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পানি প্রদানের কম পক্ষে ১ ঘন্টা পর বাচ্চাগুলোকে খাদ্য খেতে দেয়া যেতে পারে। প্রথম সপ্তাহে প্রতিটি বাচ্চাকে প্রতিদিন ৫ গ্রাম করে খাবার পানি দিতে হবে। এরপর প্রতি সপ্তাহে ৫ গ্রাম করে বাড়িয়ে ৮ সপ্তাহে ৪০ গ্রাম খাবার পানি দিতে হবে।

পানিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো যোগ করতে হবে ঃ

গ্লুকোজ প্রতি লিটার পানিতে ২৫ গ্রাম

ভিটামিন-সি প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম

ভিটামিন-ডব্লিউ এস প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম

- একঘন্টা গ্লুকোজ পানি খাওয়ানোর পর খাদ্য দিতে হবে
- প্রথমে ভূট্টা ভাঙ্গা খাবারের পাত্রে দিলে ভাল হয়। কারণ বাচ্চা প্রথমে ছোট দানা জাতীয় খাবার পছন্দ করে থাকে এবং এগুলো সহজে হজম হয়
- আমাদের দেশে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেশি থাকে। তাই খাবার কখনই ব্রুডারের নিচে ছিটানো উচিত নয়। এতে করে ব্রুডারের নিচে ছত্রাক জন্মাবে এবং বাচ্চা ইহা গ্রহণ করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে না
- প্রতি ৩০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি ফিডার দিতে হবে যাতে সকল বাচ্চা বিনা প্রতিযোগিতায় খাদ্য গ্রহণ করতে পারে
- দুই সপ্তাহ পর্যন্ত খাবার শেষ হওয়ার আগেই খাবার দেওয়া উচিত। না হলে কিছু বাচ্চা বড় হয়ে যাবে এবং কিছু বাচ্চা ছোট থাকবে। তবে পাত্র পরিষ্কার করার সময় সমস্ত ফিডার উঠিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে
- চার সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক ৩-৪ বার খাবার দেওয়া উচিত। এর পর দৈনিক দুই বার খাবার দিলেই চলবে
- জায়গা বাড়ানোর সাথে সাথে ফিডারের পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে হবে

পানি ব্যবস্থাপনা

- এক ঘন্টা গ্লুকোজের পানি খাওয়ানোর পর প্রয়োজন হলে পানিতে ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম অবস্থায় কখনও ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়, এতে করে পানি তিতা হয় অর্থাৎ স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বাচ্চা পানি গ্রহণ করতে চায় না
- প্রথম অবস্থায় প্রতি ৫০ টি বাচ্চার জন্য ১ লিটারের ১ টি ড্রিংকার দিতে হবে। এতে করে সকল বাচ্চা একসঙ্গে পানি খেতে পারবে। প্রতিবারই পানি দেওয়ার পূর্বে ড্রিংকার ভালভাবে ধৌত করার পর জীবাণুমুক্ত করে দিতে হবে
- পানিতে ৩ পি পি এম ক্লোরিন ব্যবহার করতে হবে। ভ্যাক্সিন বা ঔষধ পানিতে খাওয়ানোর সময় ক্লোরিন ব্যবহার করা উচিত নয়
- খাবার পানির তাপমাত্রা প্রথম অবস্থায় ২০-৩০° সেঃ এ রাখতে হবে
- চিক ড্রিংকার ৮-১০ দিন রাখতে হবে। এর পর জায়গা বাড়ানোর সাথে সাথে নিপল বা অন্য কোন ড্রিংকার দিতে হবে

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

মুরগি থেকে কাংখিত উৎপাদন পেতে হলে বাচ্চার ব্রুডিং পিরিয়ড থেকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। ব্রুডার ঘরে স্বাস্থ্যগত পরিবেশ রক্ষার্থে প্রতিদিন আচড়া দিয়ে লিটার ওলট পালট করে দিতে হবে। লিটার ভিজে গেলে সাথে সাথে তা পরিবর্তন করে দিতে হবে। বাচ্চার ঘরে তাপমাত্রা ঠিক রাখা, পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা, সময়মত খাবার দেওয়া, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা ইত্যাদি সার্বক্ষণিক তদারকি এবং মুরগিকে সুষম খাদ্য, সময় মত ভ্যাক্সিন ও ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাড়ন্ত দেশী মুরগির ব্যবস্থাপনা

বাড়ন্তকালীন সময় বা গ্রোয়িং পিরিয়ড

পুলেট মুরগির জীবনের প্রথম ১৬ সপ্তাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ১৬ সপ্তাহ যদি মুরগি পালনে কোন ভুল হয় সেই ভুল ডিম পাড়ার সময় গিয়ে সংশোধন করা যায় না। বাড়ন্ত কালে যদি মুরগির ওজন সঠিক ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সুঠাম স্বাস্থ্য বজায় থাকে সেগুলো থেকে প্রাপ্ত বয়সে আশানুরূপ ডিম পাওয়া যায়। বাচ্চার শারীরিক কাঠামোর ৯৫% গঠিত হয় ১২ সপ্তাহের মধ্যে। বাড়ন্ত বয়সে পুষ্টি ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা মুরগির শারীরিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুরগির বাড়ন্ত কালীন সময়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপনা গুলো সঠিক ভাবে পালন করতে হবে।

- আলোক ব্যবস্থাপনা
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- পানি ব্যবস্থাপনা ও
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

আলোক ব্যবস্থাপনা

বাড়ন্তকালে ঘরে কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন নেই। প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম আলোর প্রয়োজনীয়তা মুরগির বাড়ন্ত অবস্থার সাথে এবং দিনের পরিধির পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। বাড়ন্তকালে দিনের আলো ব্যতিত রাতে ঘরে অপরিকল্পিতভাবে আলো জ্বেলে রাখলে আগাম যৌন পরিপক্কতা আসবে এবং ডিম পাড়া শুরু করবে, যা পরবর্তীতে ডিম পাড়ার হারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

একটি ফ্লকে কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে বা মুরগি গুলো কি পরিমাণ খাবার খাবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। মুরগির খাদ্য গ্রহণ কম বা বেশি হয় খাদ্যে পর্যাপ্ত পুষ্টি আছে কিনা তার উপর। এছাড়াও ঘরের তাপ, মুরগির ওজন এর উপর নির্ভর করে। মুরগির খাবারে শক্তি এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকতে হবে যাতে মুরগির স্বাস্থ্য এবং উৎপাদন দক্ষতা বাড়ে। মুরগির যে সব মূল উপাদান দরকার তা হলো পানি, এমাইনো এসিড, এনার্জি/শক্তি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমূহ। উপরোক্ত উপাদানগুলো সঠিকভাবে পেতে খাদ্য উপাদানগুলির মান এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। কাঁচামালের গুণগত মান এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগত মান কমে যায়। উপরোক্ত বিষয় সমূহ যদি সঠিক না হয় তাহলে শেষের দিকে মুরগির শারীরিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

- কোন অবস্থাতেই মেয়াদোত্তীর্ন খাদ্য খাওয়ানো যাবে না
- ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক তিন বা ততোধিক বার সতেজ খাবার সরবরাহ করতে হবে। ছয় সপ্তাহ পর থেকে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ এবং দৈহিক ওজন (সারণী- ২) চার্ট এর সাথে তুলনা করে দেখতে হবে
- খাদ্যের ব্যাগ শুকনো বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে
- ব্যাগের মুখ খোলার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাবার শেষ করতে হবে
- খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য পাত্রের ৩ ভাগের ২ ভাগ পূর্ণ করে খাদ্য দিতে হবে
- খাদ্যের পাত্র সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- খাদ্য দীর্ঘক্ষণ পাত্রে থাকলে খাদ্যের বাজে গন্ধ ও খাদ্য গ্রহণের আকর্ষণ কমে যায় তাই দৈনিক কমপক্ষে ৩ বার খাদ্য দেয়া শ্রেয়

- একবার ক্রয় করা বা প্রস্তুতকৃত খাদ্য ৭ দিনের মধ্যে ব্যবহার করা উচিত
- খাদ্যের গুণাগুণ ও ফিড ফরমুলেশনের উপর ডিম উৎপাদন নির্ভর করে তাই ভাল মানের রেডি ফিড বা ভাল পুষ্টি বিজ্ঞানী দ্বারা ফরমুলেশন তৈরী করে নিতে হবে

সারণী-২ বাড়ন্তকালীন সময় মুরগির খাদ্য গ্রহণের ছক

বয়স (সপ্তাহ)	শারীরিক ওজন (গ্রাম)	খাদ্য গ্রহণ মাত্রা (গ্রাম/মুরগি/দিন)	সর্বমোট খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)
০৯	৮২৫.৪৮	৪৮.০০	৩৩৬.০০
১০	৯৫৯.৬৯	৫১.১৪	৬৩৯.৯৮
১১	১০৮৩.৯৪	৫৪.৭২	১০৭৭.০২
১২	১১৯৩.২২	৫৭.৫০	১৪৭৯.৫২
১৩	১৩০৬.৬৫	৬০.৮৫	১৯০৫.৪৭
১৪	১৪১৬.৭০	৬৪.০	২৩৫৩.৪৭
১৫	১৫০৩.৬৯	৬৭.৫৬	২৮২৬.৩৯
১৬	১৫৯০.৯২	৭০.৮৪	৩৩২২.২৭

সারনী-৩ (৯-১৬ সপ্তাহ) বয়স পর্যন্ত দেশী মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের নির্দেশনা

পুষ্টি উপাদান	গ্রোয়ার (৯-১৬সপ্তাহ)	পুষ্টি উপাদান	গ্রোয়ার (৯-১৬সপ্তাহ)
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরী/কেজি)	২৮০০	**এমাইনো এসিড (%)**	
প্রোটিন (%)	১৬	লাইসিন	০.৯১
চর্বি বা ফ্যাট (%)	৩.৫	মিথিওনিন	০.৪০
আঁশ (%)	৫.১	মিথিওনিনি+ সিস্টিন	০.৬০
জলীয় অংশ (%)	১১	ট্রিপটোফেন	০.৪৪
খণিজ পদার্থ (%)		**ভিটামিন (%)**	-
ক্যালসিয়াম	০.৬০	ভিটামিন এ (আই ইউ)	১৩২৭.৪
সোডিয়াম	০.৫৬	ভিটামিন ই (আই ইউ)	২৬.৪৭
পটাসিয়াম	০.১১	ফলিক এসিড (গ্রাম)	০.৯০
ক্লোরাইড	০.৭৫		
প্রাপ্ত ফসফরাস	০.২৩		

- আই ইউ- ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট

পানি ব্যবস্থাপনা

শারীরিক কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। পানি গ্রহণ মুরগির খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ এবং খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুরগির পানি গ্রহণের প্রবনতা তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, খাদ্য উপাদান এবং দৈহিক ওজন এর উপর নির্ভর করে। মুরগির শরীরে মাংসপেশী ও হাড় ইত্যাদির তুলনায় পানির অংশ বেশি। বিশুদ্ধ এবং পর্যাপ্ত পানির অভাবে মুরগির শারীরিক বৃদ্ধি, অবিরাম দৈহিক কার্যক্রম, উৎপাদন এবং খাদ্য রূপান্তরে প্রতিকূল প্রভাব পড়ে থাকে। পানির গুণাগুণ (পিএইচ) pH, মিনারেল এবং জীবাণু দূষিত করণ মাত্রা দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

বাড়ন্ত মুরগির ঘরে নিম্নলিখিত উপায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সচল রাখতে হবে

- বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ সঠিকভাবে আছে কিনা সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। মুরগি বড় হওয়ার সাথে সাথে পানির পাত্রের উচ্চতা বাড়াতে হবে। নিপল ড্রিংকার মুরগির মাথার উপরে এবং অন্যান্য ড্রিংকারের ক্ষেত্রে মুরগির পিঠের উচ্চতায় স্থাপন করতে হবে
- মুরগির সংখ্যা অনুপাতে পানির পাত্রের সংখ্যা ও আকার ঠিক রাখতে হবে
- দৈনিক কমপক্ষে ৪ বার পানি প্রদান করতে হবে
- পানির পাত্রে যে শেওলা জমে তা সবসময় পরিষ্কার করতে হবে
- নির্দিষ্ট সময় পর পর বা বছরে একবার পানি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। পরিষ্কার হাউজ (ঘর) এবং জীবাণুমুক্ত করা লাইনের শেষ প্রান্ত থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাব এ পরীক্ষা করতে হবে। যখন নমুনা সংগ্রহ করা হয় তখন খেয়াল রাখতে হবে যাতে পানির নমুনা দূষিত না হয়

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

- বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা বয়স্ক মুরগি থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে পুলেট মুরগি পালন করতে হবে। বয়স্ক মুরগি অনেক সময় রোগের উৎস হিসেবে কাজ করে। মুরগির মল বা বর্জ্য ভালোভাবে ও নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। যতটা সম্ভব রুটিন মোতাবেক কাজ করতে হবে যেন বয়স্ক মুরগির রোগ বাড়ন্ত বাচ্চাকে আক্রমণ করতে না পারে
- বয়স অনুযায়ী টীকা প্রদান কর্মসূচী পালন করতে হবে
- সেডের ভিতরে নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে
- খামার থেকে মরা বা অসুস্থ মুরগি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং যথাযথ ভাবে ধ্বংস বা অবলোপন করতে হবে। মুরগির মধ্যে অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দিলে বা মৃত্যুর হার অধিক হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে

বাড়ন্ত মুরগি পালনে অবশ্য করণীয় কাজ

- বাড়ন্ত সময়ে (৯-১৬ সপ্তাহ) মুরগিকে লালন পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সময়ের লালন-পালনের উপরই পরবর্তীতে ডিম উৎপাদন নির্ভর করে। বাড়ন্তকালে যত্ন ভালোভাবে করলে প্রাপ্ত বয়সে অধিক ডিম উৎপাদন আশা করা যায়
- পুলেট ডিম পাড়া শুরু করার একমাস পূর্বেই ডিম পাড়ার ঘরে স্থানান্তর করতে হবে।

তার আগে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো মেনে চলতে হবেঃ

- বাড়ন্ত মুরগির ঘরে পূর্বে অন্য মুরগি পালন করা হয়ে থাকলে ঘরের পুরাতন লিটার, খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র বের করে নিয়ে ঘর ভালোভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে
- ঘর ভালোভাবে শুকিয়ে লিটার বিছিয়ে খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র সারিবদ্ধ ভাবে ঘরে বসাতে হবে। বিশুদ্ধ পানি ও সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে
- খাবার পাত্র ও পানির পাত্র সঠিক পরিমাণে দেয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে
- বাড়ন্তকালে ঘরে কোন কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র দিনের আলোতে পালন করতে হবে। দিনের আলো ব্যতীত রাতে ঘরে আলো জ্বেলে রাখলে তাড়াতাড়ি যৌন পরিপক্কতা আসবে এবং ডিম পাড়া শুরু করবে যা মোটেই কাম্য নয়
- সঠিক টীকা প্রদান ছক তৈরী করে তা অনুসরণ করতে হবে এবং সঠিক সময়ে টীকা প্রদান করতে হবে

পঞ্চম অধ্যায়

ডিমপাড়া দেশী মুরগীর ব্যবস্থাপনা

ডিম পাড়া মুরগী বাছাই

ডিম পাড়াকালীন মুরগীর ব্যবস্থাপনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক নিয়মে ডিম উৎপাদনের জন্য গ্রোয়িং পিরিয়ডে বাচ্চার সঠিক ওজন নিশ্চিত করতে হবে। ডিম পাড়া শুরু করার পূর্বে পুলেট বাছাই করা একান্ত প্রয়োজন। ডিম পাড়া মুরগীর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো দেখে পুলেট নির্বাচন করা উচিত। কারণ তাদের ডিম উৎপাদনের উপর নির্ভর করে খামারের লাভ লোকসান। পুলেট সমূহকে ডিম পাড়ার ঘরে নেয়ার পূর্বে তাদের বাহ্যিক এবং নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলো দেখে বাছাই করতে হবে।

সারণী-৪ পুলেট বাছাই এর বৈশিষ্ট্যাবলী

ক্র.নং	বৈশিষ্ট্য	ভাল মুরগী	খারাপ মুরগী
১	শৌর্য-বীর্য/দেহের কাঠামো/অবয়ব	সতেজ, সবল	দূর্বল, ভীরু
২	ঝুঁটি	বড়, লাল, উজ্জ্বল, নরম, মসৃন	পাতলা, লম্বা, খসখসে
৩	ঠোঁট	মোটা, বাঁকা	হালকা, সরু
৪	চোখ	বড়, উজ্জ্বল, সজাগ	ছোট, ঝিমানো
৫	কানের লতি	বড়, উত্তাল, নরম	সংকুচিত ও খসখসে
৬	পালক	পরিষ্কার, গোছানো	অপরিষ্কার, বিবর্ণ, উসকো-খুসকো
৭	চামড়া	পাতলা, নরম ও চর্বিহীন	মোটা বা পুরু, শুকনো ও খসখসে
৮	পেট	বড় ও চর্বি যুক্ত	ছোট, শুকনো ও চর্বিমুক্ত
৯	মলদ্বার	বড়, পুরু ও ভেজা	ছোট, শুকনো ও চর্বিমুক্ত

মুরগীর ঘরের তাপমাত্রা

প্রত্যেক প্রাণিই আদর্শ তাপমাত্রায় তাদের উৎপাদন দক্ষতা দেখাতে সক্ষম। ডিমপাড়া মুরগী ১০-২৬° সেঃ তাপমাত্রায় ডিম দিয়ে থাকে। ডিম পাড়া মুরগীর ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা ১৫-২৩° সেঃ হওয়া উচিত। মুরগীর ঘরে তাপমাত্রা কম বা বেশি হলে ডিম উৎপাদন কমে যাবে। আবার হঠাৎ করে তাপমাত্রা উঠানামার ফলে ডিম উৎপাদনের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

ঘরের তাপমাত্রা বেশি হলে

- মুরগীগুলো ঠান্ডা জায়গা খোঁজে
- ডানা ফাঁক করে রাখে যাতে দেহ থেকে তাপ সহজেই বের করে দিতে পারে
- মুরগীগুলো মুখ হা করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। এই প্রক্রিয়াটিকে প্যান্টিং বলে
- পানি পান বেড়ে যায় এবং খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়

ঘরের তাপমাত্রা কম হলে

- সব মুরগী এক জায়গায় গাদাগাদি করে থাকে, যেন দেহ গরম হয়
- ডানা শরীরের সাথে আঁটসাট করে এঁটে রাখে
- পানি ও খাদ্য গ্রহণ কমে যায়

ডিম পাড়া মুরগীর খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা

আশানুরূপ ডিম উৎপাদনের জন্য সুষম পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য অত্যাবশ্যকীয়। মুরগীর খাবারের মধ্যে যদি প্রোটিন ও নির্দিষ্ট এমাইনো এসিড যেমন- মিথিওনিন ও সিসটিন, শক্তি, মোট ফ্যাট এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড যেমন- লিনোলিক এসিড ইত্যাদির মিশ্রণ ঠিকমত না দেওয়া হয় তা হলে ডিমের আকারও প্রয়োজন মত হয় না। এই সকল পুষ্টি মান বৃদ্ধি করে প্রাথমিক ডিমের আকার বৃদ্ধি করা যায় এবং ধাপে ধাপে কমাতে হবে পরবর্তীতে ডিম এর আকার নিয়ন্ত্রণের জন্য।

খাদ্য ও পানি সরবরাহের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে -

- ছেড়ে পালন করলে প্রতিদিন ৬০ গ্রাম খাবার দিতে হবে। আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে প্রতিদিন ৮০ গ্রাম খাবার দিতে হবে।
- খাবার গ্রহণের উপর নির্ভর করে মুরগীকে খেতে দিতে হবে
- বয়স অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে নির্দিষ্ট পুষ্টিমানের খাদ্য সরবরাহ করতে হবে
- পুষ্টিকর উপাদানগুলি পরিমাপ করতে হবে এবং পুষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার তৈরী করতে হবে
- বয়স অনুযায়ী খাদ্যের পাত্রের সংখ্যা ও আকার পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষ করে মাঁচা ও মেঝে পদ্ধতিতে পালনের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যাতে একসাথে সব মুরগী খাদ্য খেতে পারে। খাদ্য খাওয়ার জন্য মুরগীকে যাতে হড়োহুড়ি করতে না হয়
- মাঁচা ও মেঝে পদ্ধতিতে খাদ্য পাত্র সমান দূরত্বে স্থাপন করতে হবে এবং মুরগীর উচ্চতা আনুযায়ী পাত্রের উচ্চতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে মুরগী অনায়েসে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। খাঁচা পদ্ধতিতে খাদ্য টিউব ফিডারে দেওয়া হয় এবং খাদ্য অপচয় রোধের জন্য খাদ্য পাত্রের তিন ভাগের দুই ভাগ পর্যন্ত করে দিতে হবে এবং এক ভাগ ফাঁকা রাখতে হবে। পালন পদ্ধতি নির্বিশেষে প্রতিদিন ৩ বার পরিমিত পরিমাণ খাদ্য প্রদান করতে হবে
- পানি সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান এবং সবসময় ভালে মানের পানি মুরগীকে সরবরাহ করতে হবে। খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ এবং খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পানির ভূমিকা অপরিহার্য।
- বিশুদ্ধ এবং ক্রুটি মুক্ত পানির পাত্র ব্যবহার করতে হবে
- দৈনিক কমপক্ষে ৪ বার পানি প্রদান করতে হবে
- অধিক গরমে মুরগীর পানি গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে যায় তাই এ সময় বার বার ঠান্ডা পানি সরবরাহ করতে হবে
- প্রতিদিন পানির পাত্র এবং ৭-৮ দিন পর পর খাদ্যের পাত্র জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে

সারণী-৫ দেশী মুরগীর জন্য ডিম পাড়ার সময়কালীন সময়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের নির্দেশনা

পুষ্টি উপাদান	ডিম পাড়া সময়কালীন (২০-৭২ সপ্তাহ)
বিপাকীয় শক্তি (কিলো ক্যালরী/কেজি)	২৭০০
প্রোটিন (%)	১৬
ফ্যাট বা চর্বি	৩.৫
আঁশ (%)	৪.১৭
জলীয় অংশ	১১.৪০
খণিজ পদার্থ (%)	
ক্যালসিয়াম	৩.৫২
প্রাপ্ত ফসফরাস	০.৫৩
সোডিয়াম	০.৫১
পটাসিয়াম	০.৯
ক্লোরাইড	০.৬২
এমাইনো এসিড (%)	
লাইসিন	০.৭৭
মিথিওনিন	০.৩৯
মিথিওনিন + সিস্টিন	০.৬২
ট্রিপটোফেন	০.৪২
আরজিনিন	১.০
ভিটামিন	
ভিটামিন এ (আই ইউ)	৮৮.২
ভিটামিন ই (আই ইউ)	২২.৫০
ফলিক এসিড (গ্রাম)	০.৭৯

*আই ইউ- ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট

আলোক ব্যবস্থাপনা

মুরগীর ডিম উৎপাদনের উপর আলোক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রয়োজনীয় আলো পেলে মুরগীর দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম দেবার ক্ষমতা, ডিমের সংখ্যা এবং ডিমের আকার সব কিছুই ঠিক থাকে। আমাদের দেশে শীতকালে দিন ছোট হয়, এই কারণে মুরগী দিনের আলো কম পায়। আবার গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়, তাই মুরগী দিনের আলো বেশি পায়। সঠিক সময়ে কৃত্রিম আলো পুলেটের যৌন পরিপক্কতা অর্জনে সহায়তা করে এবং ডিম উৎপাদনের উপর এর প্রভাব রয়েছে। দিনের দৈর্ঘ্যের সাথে মিলিয়ে ১৮ সপ্তাহ বয়স থেকে ১২ ঘন্টা আলো প্রদান করতে হবে। এজন্য দিনের দৈর্ঘ্য যদি ১১ ঘন্টা থাকে তার সাথে ১ ঘন্টা কৃত্রিম আলো প্রদান করতে হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে (সারণীঃ ৬) অনুযায়ী কৃত্রিম আলো প্রদানের সময় বাড়াতে হবে। সূর্যাস্তের সময় মুরগীর ঘরে আলো জ্বালিয়ে কৃত্রিমভাবে দিনের দৈর্ঘ্যকে বাড়ানো যায়।

ব্রুডিং এর সময় প্রথম ২-৩ দিন ২৪ ঘন্টাই আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর দীর্ঘতম দিনটি অনুসরণ করে আলো ধীরে ধীরে কমাতে হবে। সঠিক মাত্রার আলোতে বাচ্চা পানি ও খাদ্যের অবস্থান চিনতে পারে এবং খাদ্য ও পানি খেতে অভ্যস্ত হয়।

সারণী-৬ খোলা ঘরে আবাসনের ভিত্তিতে দেশী মুরগীর আলোক কর্মসূচী-

বয়স (সপ্তাহ)	আলোক সময়কাল (ঘন্টা) প্রাকৃতিক + কৃত্রিম আলো	আলোর প্রখরতা
১-২	২৪	২০-৩০ লাক্স
৩	২৩	
৪	২২	
৫	২১	১০-২০ লাক্স
৬	২০	
৭	১৯	
৮	১৮	
৯	১৭	
১০	১৬	
১১	১৫	
১২	১৪	
১৩	১৩	
১৪-১৮	১২	
১৯	১৩	২০-৩০ লাক্স
২০	১৩.৫	
২১	১৪	
২২	১৪.৫	
২৩	১৫	
২৪	১৫.৫	
২৫-যতদিন ডিম দেয়	১৬	

আলোক কর্মসূচীর মৌলিক নীতিমালা

- বাড়ন্ত বয়সে কখনও আলোক সময়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা যাবে না
- ডিম পাড়া শুরু হলে আলোক সময়ের দৈর্ঘ্য কমানো যাবে না
- মুরগীর কাঙ্খিত শারীরিক ওজন বয়সের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ডিম উৎপাদনের শুরু থেকে ধাপে ধাপে আলো প্রদানের সময়কাল বৃদ্ধি করতে হবে

- আলো মুরগীর ডিম উৎপাদনে সহায়তা করে। ডিমপাড়া মুরগীর জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো দরকার। যদি দিনের স্বাভাবিক আলো ১৪-১৬ ঘন্টার কম হয় তবে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করে আলোক দৈর্ঘ্য ১৪-১৬ ঘন্টা করতে হবে

মুরগীর ডিমপাড়া এবং আলোক ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে

- আলো বাড়ানোর সময় মধ্যরাতের সময়কে নির্দিষ্ট করে (যেমন ১২ টা) প্রথম সপ্তাহে ১২ টা থেকে সামনের দিকে পরবর্তী সপ্তাহে ১২ থেকে পিছনের দিকে আলো কমিয়ে আনতে হবে
- ১২ সপ্তাহের মধ্যে দৈহিক ওজন আদর্শ ওজনের তুলনায় ৪০-৫০ গ্রাম বেশি হওয়া অতি জরুরী
- ১৮ সপ্তাহ বয়সে মুরগীর কাঙ্খিত ওজন না হওয়া পর্যন্ত আলোর পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো যাবে না। মুরগীর সঠিক ওজন না আসা পর্যন্ত আলোর উদ্দীপনা দিলে ডিমের আকার ছোট হয়, যদিও বেশি পরিমাণ ডিম দেয়। পরবর্তীতে সর্বোচ্চ উৎপাদনের সময় ডিম উৎপাদন কম হবে এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন দ্রুত কমে যাবে। আবার সঠিক ওজন পাওয়ার পরে আলোর উদ্দীপনা দিলে মুরগী কিছু কম ডিম দিলেও ডিমের আকার বড় হবে
- ১৮ সপ্তাহের মধ্যে মুরগীর কাঙ্খিত ওজন না আসলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে এবং আলোর উদ্দীপনা বাড়ানো যাবে না
- ১৪ ঘন্টা আলো থাকা অবস্থায় ডিম উৎপাদন ৫০% নিশ্চিত হওয়া জরুরী
- ২৮ সপ্তাহ অথবা পিক উৎপাদন থেকে মুরগীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ১৬ ঘন্টা আলো নিশ্চিত করতে হবে

ডিমপাড়া মুরগীর টীকাদান কর্মসূচী

দেশী মুরগীকে ভাইরাস এবং কিছু ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ প্রতিরোধ টীকা প্রদান করা হয়। অনেক সময় ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশি হয় যে টীকা দেওয়ার পরও রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, যেমন- রানীক্ষেত, গামবুরো, কোরাইজা এবং ফাউল পক্স ইত্যাদি। সেজন্য একটি সফল টীকা প্রদান ছক থাকা আবশ্যক। একটি সফল টীকা প্রদান ছক বা নির্দেশনা; বয়স অনুযায়ী সঠিক টীকা প্রয়োগ, উচ্চ মানদন্ডের টীকা, টীকার সঠিক সংরক্ষণ প্রণালী এবং সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

সারণী-৭ টীকাদান কর্মসূচী

ক্র. নং	বয়স	টীকার নাম	প্রয়োগ পদ্ধতি/মুরগি
১	০১	মারেক্স	ঘাড়ে চামড়ার নিচে (০.২ সিসি)
২	৫-৭ দিন	বিসিআরডিভি	চোখে ১ ফোঁটা
৩	১০-১২ দিন	গামবুরো	চোখে ১ ফোঁটা
৪	২০-২১ দিন	বিসিআরডিভি (বুষ্টার)	চোখে ১ ফোঁটা
৫	২৭-২৮ দিন	গামবুরো (বুষ্টার)	চোখে ১ ফোঁটা
৬	৩৫ দিন	ফাউল পক্স	পাখায় সুঁচ ফুটানোর মাধ্যমে
৭	৬০ দিন	আরডিভি	মাংস পেশীতে ১ সিসি কের ইনজেকশন
৮	৭০ দিন	ফাউল পক্স (বুষ্টার)	পাখায় সুঁচ ফুটানোর মাধ্যমে
৯	১০৫ দিন	রাণীক্ষেত (বুষ্টার)	পানিতে গুলিয়ে (১ ভায়াল/২০-৩০ লিটার পানিতে)
১০	১১০ দিন	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস	রানের মাংসে (.৫ সিসি)

ডিম পাড়ার বাসা

মেঝেতে বা মাঁচায় মুরগী লালন-পালন করলে মুরগীর ঘরে ডিম পাড়ার বাসা দিতে হয়। ডিম পাড়ার বাসা মুরগীর ঘরে উপযুক্ত সময়ে না দিলে ময়লা ডিম এবং মেঝেতে পাড়া ডিম সংগ্রহ করা খুবই ঝামেলা জনক হয় এবং মেঝেতে ডিম পাড়ার কারণে মুরগীর ফ্লকে ডিম খাওয়ার অভ্যাস এবং মলদ্বারে ঠোকরানো অভ্যাস দেখা দিতে পারে। যার ফলে খামারে প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। সেজন্য উপযুক্ত সময়ে ডিম পাড়ার বাসা স্থাপন করতে হয়। খাঁচায় পালন করলে ডিম পাড়ার বাসা প্রয়োজন পড়ে না। লিটারে বা মাঁচা পদ্ধতিতে পালন করলে প্রতি ৪-৫টি মুরগীর জন্য একটি ডিম পাড়ার বক্স দিতে হয়। এই বক্সের মাপ ১ X ১ X ১.২ (দৈর্ঘ্য X প্রস্থ X উচ্চতা) ঘনফুট হলেই চলবে। মুরগীর ঘরের অন্ধকারময় স্থানে যেখানে মুরগীর চলাফেরা কম এবং পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে, সেসব স্থানে ডিম পাড়ার বাসা স্থাপন করতে হবে এবং মুরগীর পরিচিতির জন্য ডিম পাড়া শুরু করার ২ সপ্তাহ পূর্ব থেকেই বাক্স দিতে হবে এবং বাক্সে নরম ও আরামপ্রদ দ্রব্যাদি লিটার হিসাবে দিতে হবে।

বাণিজ্যিক খামারে দুই ধরনের ডিম পাড়ার বাসা ব্যবহৃত হয়।

- আলাদা আলাদা/পৃথক বাসা
- দলভিত্তিক বাসা

মেঝেতে ডিম পাড়া

মেঝেতে পাড়া ডিম সবসময় ময়লা ও জীবাণুযুক্ত হয়ে থাকে। ফলে এর বাজার দরও কম হয়। মেঝেতে ডিম পাড়া অভ্যাসের কারণসমূহ নিম্নে দেয়া হলোঃ

- উপযুক্ত সময়ে মুরগীর ঘরে ডিম পাড়ার বাসা স্থাপন না করলে
- সঠিক সংখ্যক বাসা স্থাপন না করলে
- বাসার পরিমাণ সঠিক না হলে অর্থাৎ খুব বড় বা খুব ছোট হয়ে গেলে
- বাসা ঘরের নির্জন, ছায়াযুক্ত এবং শান্ত স্থানে না হলে
- বাসা আরামপ্রদ এবং এর ধরন সঠিক না হলে
- বাসায় ব্যবহৃত লিটার দ্রব্যের ত্রুটি থাকলে

উপরোক্ত বিষয়গুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মেঝেতে ডিম পাড়ার অভ্যাসগুলো কমানো যায়।

লিটার ব্যবস্থাপনা

লিটার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম দিক। লিটার ব্যবস্থাপনার উপর মুরগীর ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ভর করে। লিটার ব্যবস্থাপনার উপর মুরগীর স্বাস্থ্য, খাদ্য গ্রহণ, পানি পানের পরিমাণ, খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা এবং সঠিক সময়ে সঠিক ওজন অনেকটাই নির্ভর করে।

লিটারের প্রয়োজনীয়তা

- আর্দ্রতা শোষণ করে
- লিটার ভেজা বিষ্ঠাকে শোষণ করে ফলে ভেজা বিষ্ঠা সরাসরি মুরগীর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখে
- শীতকালীন আবহাওয়ায় ঠান্ডা মেঝের সরাসরি সংস্পর্শে আসতে বাঁধা দেয়

লিটারের গুনগত বৈশিষ্ট্য

- শোষণ ক্ষমতা থাকতে হবে এবং ওজনে হালকা হতে হবে
- দামে সস্তা এবং বিষক্রিয়া মুক্ত হতে হবে
- বাতাসের আর্দ্রতা মুক্ত হবে
- অধিক ঘনত্বে নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম থাকবে

বিভিন্ন ধরনের লিটারের বৈশিষ্ট্য

বাজারে বিভিন্ন ধরনের লিটার পাওয়া যায়। তার মধ্যে কাঠের গুড়া ও ধানের তুষ উল্লেখযোগ্য। কাঠের গুড়া মাঝে মাঝে আর্দ্র হয় ফলে ছত্রাক জন্মানোর সম্ভাবনা রয়েছে এবং মুরগী প্রায়ই এটা খেয়ে ফেলে যা থেকে Aspergillosis হয়। ধানের তুষ শুষ্ক থাকে এবং সহজলভ্য। এর ভাল শোষণ ক্ষমতা আছে এবং অধিক ব্যবহৃত হয়।

লিটার মূল্যায়ন

লিটার আর্দ্র কিনা তা দেখার জন্য এক মুঠো লিটার হাতে নিয়ে হাত মুঠ করলে হাতের সাথে কিছু লিটার লেগে থাকবে এবং যখন মেঝেতে পড়বে তখন ভেঙ্গে যাবে। যদি আর্দ্রতা খুব বেশি থাকে তখন মেঝেতে পড়লেও তা আগের অবস্থায় দলবদ্ধ থাকবে। যদি লিটার খুব বেশি শুষ্ক হয় তখন হাতের তালুতে লেগে থাকে না। লিটারের অতিরিক্ত আর্দ্রতা মুরগীর জন্য ভাল নয়, শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় আবার ঘরে এম্যোনিয়া গ্যাসের মাত্রাও বাড়তে পারে। তবে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে পানির পাত্র থেকে পানি পড়ে লিটার যেন ভেজা না থাকে। যদি ভেজা দেখা যায় তাহলে তা শনাক্ত করে লিটার পরিবর্তন করে ভাল লিটার দিতে হবে।

বি. দ্রঃ

- লিটার হিসাবে ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ব্যবহার করা যায়
- কাঠের গুড়া ব্যবহার করলে প্রথমে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে ফরমালিন বা কপার সালফেট দিয়ে স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে
- ৩-৮ ইঞ্চি পুরু করে লিটার সমস্ত ঘরে বিছিয়ে দিতে হবে
- লিটার কোন কারণে ভিজে গেলে তা সাথে সাথে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং প্রয়োজনে নতুন শুকনো এবং জীবাণুমুক্ত লিটার দিতে হবে। মুরগী জীবাণুমুক্ত রাখতে হলে লিটার শুকনো রাখা অত্যন্ত জরুরী
- লিটার প্রতিদিন আঁচড়ে দিতে হবে, যদি জমাটবদ্ধ হয়ে যায় তবে তা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করতে হবে
- মুরগীর ঝড়ে যাওয়া পালক লিটার থেকে বেছে ফেলে দিতে হবে এবং পুরাতন লিটার রোদে শুকিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না
- কোন মারাত্মক জীবাণুঘটিত রোগ দেখা দিলে সম্পূর্ণ লিটার পাল্টে ফেলতে হবে

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বল্প খরচে ঘর নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনা

ছয়টি মুরগী এবং একটি মোরগ পালন উপযোগী ঘরের বর্ণনা

ঘরের বর্ণনা (বিভিন্ন পদ্ধতি)

যদিও দেশী মুরগি ছেড়ে দিয়ে পালন করা হয়। তথাপি, বাড়তি খাবার দেয়ার সময় ও রাত্রি কালীন আবদ্ধ করার জন্য স্বল্প খরচে ও নিরাপদ ঘর তৈরী করা প্রয়োজন। নিম্নে দেশী মুরগি পালন উপযোগী ঘরের ডিজাইন বর্ণনা করা হলোঃ

মুরগির বাসস্থান নির্মাণ

দেশী মুরগির ঘর করার জন্য বেশী ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। স্বল্প খরচে বাড়িতে পড়ে থাকা পুরাতন কাঠ, বাঁশ, টিন/হার্ডবোর্ড/ মোটা পলিথিন দিয়েই ঘর নির্মাণ করা যায়। তবে, কিছু আনুষঙ্গিক উপকরণ ও মুজুরী খরচ সহ এলাকা ভেদে এর নির্মাণ খরচ ১০০০-১৫০০ টাকা হতে পারে।

ঘরের মাপ ঃ

১) নাইট সেল্টার ঃ রাত্রি কালীন আবদ্ধ করার জন্য ঘরকে নাইট সেল্টার বলা হয়। চিত্র অনুসরণে নাইট সেল্টারের দৈর্ঘ্য X প্রস্থ X উচ্চতা হবে যথাক্রমে ৫ ফুট X ৩.৫ ফুট X ৪ ফুট (মাঁচা থেকে)। মাটি থেকে ১-১.৫ ফুট উচ্চতায় মাঁচা হবে। ৪ ফুট উচ্চতার মাঝখানে বাঁশের মাঁচা তৈরী করে ২ ফুট করে ২ টি অংশে ভাগ করে উপরের অংশে মুরগীর ডিম পাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বাঁশ-কাঠ ও টিন দিয়ে ঘরটি তৈরী করতে ২৫০০-৩০০০ টাকা খরচ হতে পারে। এভাবে নির্মিত ঘরটি অনায়াসে প্রায় ৫-৭ বছর ব্যবহার করা যাবে।

নাইট সেল্টার

২) ক্রিপ ফিডার ঃ দিনের বেলায় যে ঘরে বাড়তি খাবার দেয়া হয় তাকে ক্রিপ ফিডার বলে। বাঁশের ফালি ও পলিথিন দিয়ে চিত্র অনুসরণ করে ক্রিপ ফিডার তৈরী করা যায়। ইহার মাপ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) হবে = ৫ ফুট x ৩ ফুট x ৪ ফুট (মাটি থেকে)। ইহার দৈর্ঘ্য বরাবর মাঝখানে (২ ফুট ও ৩ ফুট দূরত্বে) পার্টিশন তৈরী করে ২ টি অংশে ভাগ করতে হবে। ছোট অংশে বাচ্চাদের খাদ্য এবং বড় অংশে বড়দের খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এভাবে ৩ সপ্তাহ পর বাচ্চাদের মা থেকে আলাদা করে খাদ্য প্রদান করলে বাচ্চাগুলি যেমন দ্রুত বেড়ে উঠবে তেমনি মা মুরগী দ্রুত পুনরায় ডিম দেয়া শুরু করবে। ক্রিপ ফিডার ব্যবহারের এটি একটি অন্যতম সুবিধা। তাছাড়া, খাদ্যের অপচয়ও কম হবে। বাঁশ ও উপরের টিন দ্বারা নির্মিত ক্রিপ ফিডারে ১৫০০-২০০০ টাকা খরচ হতে পারে। যা ৩-৪ বৎসর অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে।

ক্রিপ ফিডার

৩) ক্রিপ ফিডার ও নাইট সেল্টার একত্রে ঃ বাড়ীর আঙ্গিনায় পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে দুটি একত্রে করলে সুবিধাজনক হয়। নীচের চিত্র অনুসরণে নাইট সেল্টার অংশের দৈর্ঘ্য হবে ৩.৫ ফুট এবং ক্রিপ ফিডার অংশের দৈর্ঘ্য হবে ৪.৫ ফুট। প্রস্থ এবং উচ্চতা পূর্বের নাইট সেল্টারের মতই হবে। এভাবে ক্রিপ ফিডার ও নাইট সেল্টার একত্রে নির্মাণ করলে জায়গা যেমন কম লাগে, তেমনি নির্মাণ খরচও কম হয়। বাঁশ, টিন ও নেট দ্বারা নির্মাণ খরচ পড়বে ৫০০০-৬০০০ টাকা এবং এটি প্রায় ৭-৮ বছর টেকসই হবে।

ক্রিপ ফিডার ও নাইট সেল্টার একত্রে

নাইট সেল্টার আবার ২ ভাবে করা যায়। যথাঃ মাঁচায় ও মেঝেতে বা ডিপ লিটার পদ্ধতিতে। তবে মেঝেতে পালন করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

ক) মাঁচা পদ্ধতি ঃ যে অঞ্চলের মাটি অধিক আর্দ্র থাকে সেই সব অঞ্চলে এই মাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা শ্রেয়। বাঁশ বা কাঠ দ্বারা সহজেই মাঁচা তৈরী করা যায়। বাঁশ বা কাঠ ছোট ছোট ফালি করে পেরেক দ্বারা আটকিয়ে মাঁচা তৈরী করা যেতে পারে। মাঁচায় ১ ইঞ্চির চেয়ে কম ফাঁক থাকবে এবং মাটি থেকে এর উচ্চতা হবে ১-১.৫ ফুট। ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হবে এবং ঘরের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট হবে। ঘরের মাঁচা থেকে কলামের উচ্চতা কমপক্ষে ৩ ফুট হবে। মাঁচা পদ্ধতির মেঝেতে লিটারের প্রয়োজন হয় না। রোগ ব্যাধি কম হয় এবং স্বল্প পরিসরে বেশী সংখ্যক মুরগি পালন করা যায়।

খ) মেঝে বা ডিপ লিটার পদ্ধতি ঃ সাধারণত পাকা/ শক্ত মেঝের উপর ২-৩ ইঞ্চি পুরু জীবাণুমুক্ত তুষ বা কাঠের গুড়া বা ছাই বিছিয়ে মুরগি পালন করা যায়। এই পদ্ধতিতে প্রারম্ভিক ব্যয় কম, কিন্তু রোগ-বালাই এর ঝুঁকি বেশী।

মেঝেতে মুরগি পালন

মুরগির ঘরের স্থান নির্বাচন

মুরগির ঘরের স্থান নির্বাচন করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবেঃ

- বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত উঁচু জায়গা
- পর্যাপ্ত আলো এবং মুক্ত বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকতে হবে
- আশে পাশের খামার এবং জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা থেকে নিরাপদ দূরত্বে ঘর নির্মাণ করতে হবে
- আশে পাশে পঁচা ডোবা ও নর্দমা থাকবে না
- মুরগির খামারে প্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহন ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য চলাচলের রাস্তা থাকতে হবে
- বিশুদ্ধ পানি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- বিষ্ঠা এবং লিটার সরিয়ে ফেলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকতে হবে

বাণিজ্যিক ভাবে দেশী জাতের মুরগি পালন উপযোগী ঘরের বর্ণনা

বাণিজ্যিক ভাবেও বিএলআরআই উদ্ভাবিত উন্নত দেশী জাতের মুরগি বিশেষ করে হিলি জাতের মুরগি ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত লালন-পালন করে বাজারজাত করা যায়। এমতাবস্থায়, ১০০০ মুরগি পালনের জন্য ঘরের মাপ (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) হবে যথাক্রমে ৬০ ফুট x ১৫ ফুট x ৫ ফুট (মাঁচা থেকে)। মাটি থেকে মাঁচার উচ্চতা ৩-৪ ফুট হলে ভাল হয়। নীচের চিত্র অনুসরণে বাঁশ ও বিশেষ মোটা পলিথিন দ্বারা স্বল্প খরচে সহজেই স্বাস্থ্যসম্মত ঘর, মাঁচা ও বেড়া নির্মাণ করা যায়। ভাল পাকা বাঁশ কয়েকদিন ভিজিয়ে ব্যবহার করলে ঘর টেকসই হয়। বাঁশ ও উপরে মোটা পলিথিন দিয়ে ঘর তৈরীর খরচ পড়বে ৪০-৫০ হাজার টাকা। এটি ৫-৭ বছর ব্যবহার করা যাবে। টিন ও বাঁশ দ্বারা ঘর তৈরীর খরচ পড়বে ৭০-৮০ হাজার টাকা, যা ৮-১০ বা তার অধিক সময় ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাঁশ দ্বারা স্বল্প খরচে নির্মিত মাঁচা

সপ্তম অধ্যায়

মুরগির ঠোঁট কাটা বা ডিবিকিং

ঠোঁট কাটা বা ডিবিকিং

ঠোঁট বেশী লম্বা এবং সূঁচালো হলে মুরগি ঠিকমত খেতে পারে না এবং খাদ্য অপচয় হয়। অনেক সময় ঠোকরা ঠুকরির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই নির্দিষ্ট বয়সে প্রতিটি মুরগির ঠোঁটের কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়। ইহাকেই ঠোঁটকাটা বা ডিবিকিং বলা হয়।

ঠোঁট কাটার উদ্দেশ্য

- মুরগি কোন প্রকার অসুবিধা বা স্ট্রেস ছাড়া ঠিকমত যেন খেতে পারে
- খাদ্য যেন অপচয় না হয় এবং
- অনেক সময় ঠোকরা ঠুকরির প্রবণতা দূর করার জন্য

ঠোঁট কাটার সময় বা বয়স

- ৮-১০ দিন বয়সে ঠোঁট ছ্যাকা দেয়া এবং প্রয়োজনে পুনরায়; এবং
- ১০-১২ সপ্তাহ বয়সে ঠোঁট কাটা

ঠোঁট ছ্যাকা দেয়া /কাটার পদ্ধতি

- বাচ্চার ক্ষেত্রে সূচালো ঠোঁট হালকা ছ্যাকা দেয়া হয়
- বড় মুরগিতে মুরগির নাকের ছিদ্র হতে ঠোঁটের ১/৩ অংশ দক্ষতার সাথে কেটে দিতে হয়
- মনে রাখতে হবে ঠোঁট ছ্যাকা দেয়া /কাটা অবশ্যই অভিজ্ঞ লোক এবং ভালো মেশিন দ্বারা করতে হবে

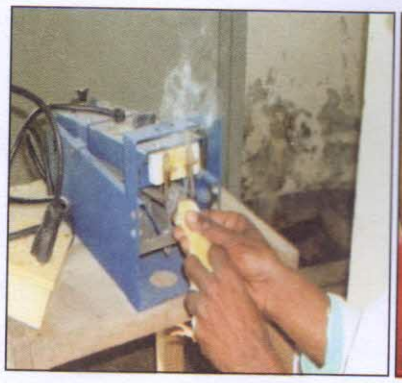

বাচ্চার ঠোঁটে ছ্যাকা দেওয়া

মুরগির ঠোঁট কাটা

ঠোঁট ছ্যাকা দেয়ার পর যত্ন

ঠোঁট কাটার অনুপযুক্ত সময়

- বাড়ন্ত ও ডিম দেয়ার সময় মুরগীর ঠোঁট কাটা উচিৎ নয়
- মুরগির কোন রোগ হলে
- মুরগি কোন ধকল/ পীড়ন অবস্থায় পতিত হলে
- ভ্যাক্সিন বা টীকা দেয়ার কমপক্ষে ২ দিন আগে/ পরে

মুরগির ঠোঁট কাটার সময় সতর্কতা অবলম্বন

- অসুস্থ অবস্থায় বাচ্চা বা পুলেটের ঠোঁট কাটা উচিত নয়
- ঠোঁট কাটার সময় তাড়াহুড়া করা উচিত নয় এবং বাচ্চা বা মুরগি যাতে পাইলিং না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- ঠোঁট কাটার সময় থেকে পরবর্তী ৩ দিন ইলেকট্রোলাইট এবং ঠোঁট কাটার আগের দিন থেকে ভিটামিন- K মিশ্রিত পানি সরবরাহ করতে হবে
- অভিজ্ঞ লোক এবং ভালো মেশিন দ্বারা ঠোঁট কাটতে হবে
- কম ভোল্টেজে ঠোঁট কাটার মেশিন চালালে বা মেশিনের ব্লেড ভোতা হলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়ে মুরগি মারা যেতে পারে

ঠোঁট কাটার পরবর্তী পরিচর্যা

- পরবর্তী ৩ দিন ইলেকট্রোলাইট ও ভিটামিন-সি মিশ্রিত পানি সরবরাহ করতে হবে। ঠোঁট কাটার পর খাবার পাত্রে খাদ্যের গভীরতা বাড়িয়ে দিতে হবে এবং কিছুক্ষণ পর পর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে
- খাদ্যের সাথে অতিরিক্ত আমিষ যোগ করা যেতে পারে
- পানির সাথে ২-৩ দিন মাল্টিভিটামিন বা ডব্লিউ-এসও দেয়া যেতে পারে
- মুরগি যাতে পাইলিং বা অন্য কোন ধকলে না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে

অষ্টম অধ্যায়

হঠাৎ ডিম উৎপাদন ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণ এবং প্রতিকারের উপায়

ডিম পাড়া মুরগীর খামারে হঠাৎ ডিমের উৎপাদন ও মোরগ-মুরগীর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যাওয়া একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সব খামারীকে মাঝে মধ্যেই এই সমস্যায় পড়তে হয় এবং এই বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে। হঠাৎ ডিম ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্য নানাবিধ কারণ থাকতে পারে। যেমনঃ-

১. খাদ্য সুষম না হলে ঃ ডিম পাড়া মুরগীর জন্য যে পরিমাণ আমিষ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ও ক্যালোরি সম্পন্ন খাবার প্রয়োজন তা না দিয়ে যদি কম উপাদান দিয়ে খাদ্য তৈরী করা হয় তবে খাদ্য সুষম হবে না এবং এই সুষম খাদ্য সরবরাহ না করায় হঠাৎ ডিম ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ ডিম পাড়া মুরগীকে সবসময় সুষম খাদ্য (balanced ration) সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কোন সময়ই এটির ঘাটতি করা যাবে না।

২. মোরগ-মুরগীর চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ব্যহত হলে ঃ ডিমের শতকরা ৭০ ভাগ পানি। ডিম উৎপাদনের জন্য পানি একটি অপরিহার্য উপাদান। যদি কখনো কোন কারণবশতঃ মোরগ-মুরগীর চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যহত হয় তবে সেক্ষেত্রে ডিম পাড়া মুরগীর খাদ্য গ্রহণ ও ডিমের উৎপাদন কমে যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ সব সময় সেডে মোরগ-মুরগীর চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

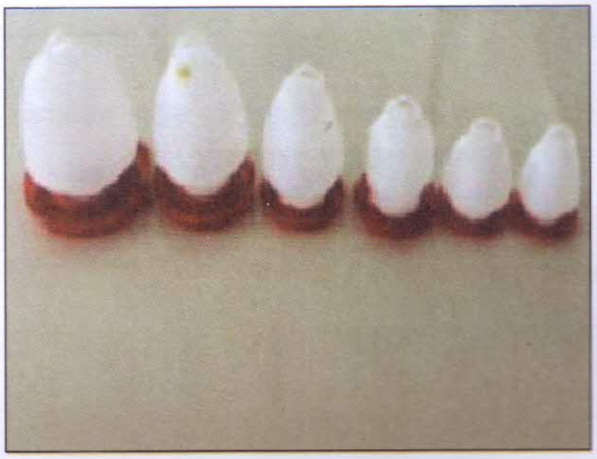

বিশুদ্ধ খাবার পানি

৩. ঘরে আলোর হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে ঃ আলো ডিম্বাশয়ে ডিম্বানু উৎপাদন স্থান ও ডিমের পূর্ণতা প্রাপ্তি ও খাদ্য গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাধারণত একটা ডিম পাড়া মুরগীর ঘরে সর্বমোট ১৬ ঘন্টা আলো রাখার প্রয়োজন হয়। যদি কোন কারণে আলোর পরিমাণ কম বেশী হয় তবে ডিম ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ ডিম পাড়া মুরগীর ঘরে যাতে ১৬ ঘন্টা আলো জ্বলে সে বিষয়ে কার্যকরি ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে ঃ মুরগির জন্য আদর্শ তাপমাত্রা হল ২২-২৪ ডিগ্রী সেঃ এবং আদ্রর্তা হলো ৫৫-৬৫ %। যদি হঠাৎ প্রচন্ড গরম পড়ে এবং তাপমাত্রা কাঙ্খিত হারের তুলনায় বেড়ে যায়, তবে ডিম পাড়া মুরগীর খাদ্য গ্রহণ ও ডিমের উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিকার ঃ আমাদের দেশে সাধারণত শীতের তুলনায় গরমেই উৎপাদন মারাত্নক ভাবে হ্রাস পায়। ডিম পাড়া মুরগীকে অত্যাধিক গরম থেকে রক্ষা করার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গুলো নেওয়া যেতে পারেঃ

ক) মুরগীর ঘর নির্মাণকালে ঘর ঠান্ডা রাখার নির্মাণ কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

খ) টিনের চালের নিচে সিলিং এবং চালের উপরে পানি স্প্রে এবং ভেজা ছালা দিয়ে চাল ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) ঘরে বাতাস চলাচলের জন্য বৈদ্যুতিক ফ্যানের পরিবর্তে প্রয়োজনে বড় Exhaust ফ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে। পার্শ্বে ছায়াযুক্ত বড় গাছ থাকলে বাতাস চলাচলে এবং ঘর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে।

ঘ) যখন সূর্যের তাপ প্রখর এবং বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে সে সময় ঘরের মধ্যে ঘন কুয়াশার ন্যায় পানি স্প্রে করা যেতে পারে।

ঙ) সর্বদা পরিষ্কার ঠান্ডা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। মুরগীর দেহে পানি শূন্যতা এবং ধকল প্রতিরোধে ভিটামিনযুক্ত ইলেকট্রোলাইটস পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

চ) খাদ্য গ্রহণ করলে মুরগীর শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। দিনের তাপমাত্রা যখন অপেক্ষাকৃত কম থাকে তখন মুরগীকে খাবার সরবরাহ করতে হবে। যখন তাপমাত্রা বেশী থাকে তখন শুধু ঠান্ডা পানি খেতে দিতে হবে।

ছ) গরমের সময়ে প্রতি কেজি খাবারের সাথে ৫ গ্রাম পরিমাণ ভিটামিন-সি মিশালে মুরগি গরমজনিত ধকল কাটিয়ে উঠতে পারে। এছাড়া কলিবেসিলোসিস প্রতিরোধে ভিটামিন-সি এবং ভিটামিন-ই অত্যন্ত কার্যকর।

জ) গরমের সময়ে ম্যাস খাদ্যের পরিবর্তে পিলেট খাদ্য সরবরাহ মুরগীর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

ঝ) খাদ্যের পাত্র এবং পানির পাত্রের সংখ্যা বাড়ানো ভাল।

৫. হঠাৎ কোন রোগে আক্রান্ত হলে ঃ আমাদের দেশে মুরগির রোগ বালাই একটি মারাত্মক সমস্যা। প্রতি বৎসরই হাজার হাজার মোরগ-মুরগী বিভিন্ন রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে এবং খামারীগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যে সমস্ত রোগ ব্যধিতে ডিম পাড়া মুরগী আক্রান্ত হলে ডিমের উৎপাদন ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যায় তার মধ্যে রাণীক্ষেত, কলেরা, কোরাইজা, সালমোনিলোসিস, মাইকোপ্লাজমোসিস, কলিবেসিলোসিস, ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস, ই-কলাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রতিকার ঃ খামারের মোরগ-মুরগী যাতে রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত না হয় সেই জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং নির্দিষ্ট রোগের জন্য প্রতিষেধক ব্যবহার করতে হবে।

৬. উত্তেজনা বা ভয় ঃ হঠাৎ বিকট আওয়াজ, বন্য জীব-জানোয়ার দেখতে পেলে, অচেনা বা বেশী লোক দেখলে ডিমপাড়া মুরগীর খাদ্য গ্রহণ ও ডিমের উৎপাদন কমে যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ খামারের মুরগির সেডে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় লোকজনের চলাচল পরিহার করতে হবে এবং প্রাণী যাতে আক্রমণ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. মুরগীর গায়ে উকুন হলে ঃ ডিম পাড়া মুরগী যদি বাহ্যিক প্যারাসাইটে আক্রান্ত হয় তাহলে ডিম উৎপাদন কমে যেতে পারে।

মুরগীতে উকুন সমস্যা

মুরগীতে রেড মাইটস সমস্যা

প্রতিকার ঃ মুরগী যাতে উকুন দ্বারা আক্রান্ত হতে না পারে সেজন্য সেডগুলি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আর যদি নিতান্তই উকুন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে অনুমোদিত উকুননাশক ঔষধ ব্যবহার করে উকুন দমন করতে হবে।

৮. কৃমি রোগে আক্রান্ত হলে ঃ ডিম পাড়া মুরগীর ঝাঁকে নিয়মিত ভাবে প্রতি ২/৩ মাস অন্তর অন্তর কৃমির ঔষধ খাওয়ানো উচিত। যদি তা না করা যায় তবে ডিম পাড়া মুরগী কৃমি রোগে আক্রান্ত হয়ে ডিমের উৎপাদন ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

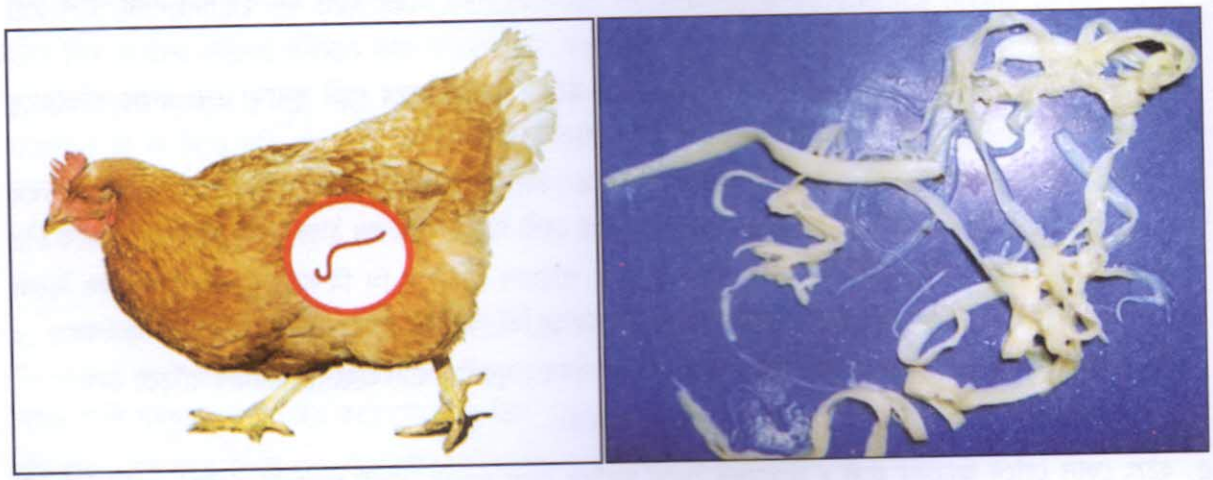

মুরগিতে টেপওয়ার্ম বা ফিতা কৃমি জনিত সমস্যা

প্রতিকার ঃ সিডিউল অনুযায়ী খাদ্য/পানির সাথে কৃমি নাশক ঔষধ ব্যবহার করে কৃমি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৯. হঠাৎ জায়গার পরিবর্তন ঃ ডিম পাড়া মুরগী যেখানে ডিম পাড়ে যদি কোন কারণবশতঃ উল্লেখিত জায়গার পরিবর্তন ঘটে তবে খাদ্য গ্রহণ ও ডিমের উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।

প্রতিকার ঃ ডিম পাড়া মুরগী ডিম পাড়া শুরু করলে জায়গার পরিবর্তন করা উচিত নয়।

১০. ভ্যাক্সিন ঃ রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা দিলে অনেক সময় ডিম পাড়া মুরগীতে প্রতিষেধক হিসাবে ভ্যাক্সিন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ডিম পাড়া মুরগীতে ভ্যাক্সিন ব্যবহারের ফলে ধকল জনিত কারণে হঠাৎ করে খাদ্য গ্রহণ ও ডিমের উৎপাদন কমে যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ ভ্যাক্সিন প্রয়োগের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ভ্যাক্সিন প্রদানের পূর্বশর্তগুলি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

১১. ডিবিকিং জনিত কারণ ঃ ডিম পাড়া মুরগীর ঝাঁকে অনেক সময় বদ অভ্যাস জনিত ঠুকরা-ঠুকরি রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা দেয়। ঠোকরা-ঠুকরি রোগের প্রদূর্ভাব দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ডিবিকিং করার প্রয়োজন হয়। ডিম পাড়া মুরগীর ঝাঁক ডিবিকিং করার ফলে ধকলজনিত কারণে খাদ্য গ্রহণ ও ডিমের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ ডিবিকিং করার সময় পানিতে ভিটামিন-K ও সাথে মাল্টিভিটামিন জাতীয় উপাদান মিশ্রণের ফলে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়।

নবম অধ্যায়

মুরগিতে লক্ষণীয় বদ অভ্যাস সমূহ, মুরগির বদ অভ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব, কারণ ও প্রতিকারের উপায়

মুরগির বদ অভ্যাস সমূহ

প্রায় সকল গৃহপালিত পশু পাখিতে কিছু সংখ্যক প্রাণী থাকতে পারে যারা স্বাভাবিক আচরণের বাহিরে কিছু আচরণ করে থাকে। এসব অস্বাভাবিক আচরণকে আমরা বদ অভ্যাস বলে গন্য করে থাকি। যেমনঃ একটি গাভী দুধ দোহনের সময় লাথি মারে অথবা একটি গাভী নিজের দুধ নিজেই খেয়ে ফেলে। মুরগিতেও এ ধরনের কিছু বদ অভ্যাস দেখা যায়। এসব বদ অভ্যাস বা অস্বাভাবিক আচরণের ফলে মুরগির উৎপাদনশীলতা ব্যহত হয়। কাজেই মুরগির খামার থেকে লাভবান হতে হলে মুরগির স্বাভাবিক আচরণ ও অস্বাভাবিক আচরণ বা বদ অভ্যাস সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেননা মুরগির এসব আচরণ খামারের আয় কমিয়ে দেয়। মুরগিতে যে সব বদঅভ্যাস দেখা যায় সেগুলো প্রধানত নিম্নরূপঃ

- একে অপরকে ঠুকরিয়ে আহত করে। এ বদ অভ্যাসটি ডিম পাড়া মুরগীতে কখনো কখনো মারাত্মক আকার ধারণ করে। একটি মুরগি অপর একটি মুরগীর ডিম পাড়ার রাস্তায় ঠুকরাতে ঠুকরাতে নাড়িভুড়ি বের করে ফেলে
- ডিম ভেঙ্গে ফেলে এবং ডিম খেয়ে ফেলে
- নিজের অথবা অপরের পালক ঠুকরিয়ে উঠিয়ে ফেলে। এটি সাধারণত বাড়ন্ত মুরগিতে দেখা যায়
- পায়ের নখ বা হাঁটুর গিড়া ঠোকরানো, এটিও বাড়ন্ত মুরগিতে দেখা যায়
- লিটার ঠুকরানো, দৃশ্যত তেমন কোন কারণ ছাড়াই লিটারে ঠুকরায়
- খাদ্যের পাত্র বা পানির পাত্রের উপর দাড়ানোর কোন ব্যবস্থা থাকে না বরং মুরগি যাতে খাদ্য বা পানির পাত্রে না দাঁড়াতে পাড়ে সেরূপ ভাবে গার্ডার দেয়া থাকে। তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু মুরগি খাদ্য বা পানির পাত্রের উপর উঠে এবং পায়খানা করে খাদ্য পানি নোংরা ও দূষিত করে
- ঝগড়া বা মারামারি করা, একে অপরে মারামারি করে আহত করে
- খাবার ঠুকরিয়ে ফেলে দেয়া, খাবার ইচ্ছা নেই তবুও খাদ্য ঠুকরানো এবং খাদ্যের পাত্র থেকে খাদ্য ছিটিয়ে ফেলে দেয়
- পালের কিছু বড় মুরগি ছোট মুরগিকে খেতে দেয় না
- ঘরে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো সব মুরগি ঘরের এক কোনে গাদাগাদি করে থাকে

মুরগির বদ অভ্যাসের কারণ

মুরগিতে দৃশ্যমান বদ অভ্যাস সমূহের কারণ নির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ। তবে বদ অভ্যাসের সম্ভাব্য কারণগুলো নিম্নরূপঃ

- খাদ্যে কতিপয় খণিজ পদার্থ বা অন্যান্য micronutrient এর অভাব থাকলে, যেমনঃ লবণ, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি
- হঠাৎ খাদ্য পরিবর্তন করলে বা পিলেট হতে ম্যাশ খাদ্য পরিবর্তন করলে
- অল্প জায়গায় গাদাগাদি করে অনেক মুরগি রাখলে

- দীর্ঘ সময় মুরগির ঘরে খাদ্যের পাত্র ও পানির পাত্র খালি রাখা বা মুরগিকে অনাহারে রাখা
- ঘরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেলে
- ছোট ও বড় মুরগি বা বিভিন্ন বয়সের মুরগি একসাথে রাখলে
- মুরগির সংখ্যার তুলনায় খাদ্য ও পানির পাত্র কম থাকলে
- ভয় পেলে উচ্চ শব্দ, কাক, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদির ভয়ে মুরগি অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে একে অপরেক আক্রমণ করে
- মুরগি এক ঘরে থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তর করলে বা একদলের সাথে অন্য দলের মুরগি মিশালে
- ডিম পাড়ার সর্বোচ্চ অবস্থায় মুরগীর শরীর থেকে অধিক পরিমাণ খণিজ ও ভিটামিন ডিমে ব্যবহৃত হয়, এর প্রভাবে ঐ সময় কিছু ঠুকরা ঠুকরির অভ্যাস দেখা দিতে পারে
- তিক্ত বা বিস্বাদ ঔষধ খাদ্যের সাথে অথবা পানিতে মিশিয়ে দিলেও কখনো কখনো মুরগির আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়

মুরগির বদ অভ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব

মুরগিতে বিভিন্ন ধরনের বদ অভ্যাসের কারণে যে সব ক্ষতি হতে পারে তাদের মধ্যে প্রধানতম হলো ঃ

- ডিম উৎপাদন কমে যেতে পারে অথবা উৎপাদন ঠিক থাকলেও ডিম খেয়ে ফেলার কারণে কম সংখ্যক ডিম সংগ্রহ হতে পারে
- মারামারির ফলে মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে
- লিটারে খাদ্য ছিটানো এবং লিটার থেকে পুনরায় খাদ্য খাওয়ার ফলে রোগ-জীবাণু সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে
- খাদ্যের বা পানির পাত্রে পায়খানা করলে জৈব নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়

বদ অভ্যাসের প্রতিকার

নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেগ গ্রহণ করলে মুরগির বদঅভ্যাস সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়ঃ

- মুরগির খাদ্যে সঠিক পরিমাণ খণিজ উপাদান মিশাতে হবে। বিশেষ করে খাদ্যের সাথে সঠিক ভাবে ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স দিলে ঠোকরা-ঠুকরির প্রবনতা কমে যায়
- মুরগির ঘরে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিদিন অল্প পরিমাণ (সরবরাহকৃত খাদ্যের ৩-৪%) শাকসব্জি ঝুলিয়ে দিলে মুরগি শাক-সবজি ঠুকরিয়ে খায় এবং এতে করে একদিকে মুরগির শরীরে ভিটামিনের অভাব দূর হয় অন্য দিকে একে অপরকে ঠুকরানোর বদঅভ্যাস গড়ে উঠে না
- সকল মোরগ-মুরগীকে সঠিক সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে ঠোঁট কেটে (ডি-বিকিং) দিতে হবে
- বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন সাইজের মুরগিকে একই ঘরে রাখা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন
- বয়স ও মুরগির আকারের উপর ভিত্তি করে প্রতি মুরগির জন্য যতটুকু ফ্লোর স্পেস দেয়া প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি সংখ্যক মুরগি একটি ঘরে রাখা অনুচিত
- দীর্ঘ সময় খাদ্য ও পানির পাত্র খালি না রাখা। ভুলবশতঃ বা যে কোন কারণে হঠাৎ করে খাদ্য বা পানির পাত্র কোন দিন দীর্ঘ সময় খালি রাখলে ব্যাপকভাবে ঠুকরা ঠুকরি করে অনেক মুরগি মারা যেতে পারে
- প্রতিদিন নিয়মানুযায়ী একই সময়ে খাদ্য ও পানি প্রদান করা প্রয়োজন, যাতে করে মুরগির খাবার সময় হলেই খাদ্য ও পানি পেতে পারে

- দূর্বল ও অসুস্থ মুরগি পাল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং এগুলো আলাদাভাবে চিকিৎসা দিতে হবে
- আবহাওয়ায় অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে পীড়ন রোধক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় antioxidant প্রদান করতে হবে

মুরগীর ডিম ঠুকরানো ও
ডিম খাওয়ার বদ অভ্যাস

একে অপরকে ঠুকরানোর
ফলে অসুস্থ মুরগি

মনে রাখা প্রয়োজন মুরগিতে বহুবিধ কারণ থেকে বদ অভ্যাসের উদ্ভব হতে পারে। বিচক্ষণ ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একজন খামারী নির্দিষ্ট বদ অভ্যাসের সঠিক কারণ উদঘাটন করতে পারেন। অন্যথায় কখন কোন কারণে কি ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয় তা বলা দুরূহ। জেনে রাখা ভাল বদ অভ্যাস বা অস্বাভাবিক আচরণ লাল মুরগির চেয়ে সাদা মুরগিতে বেশি পরিলক্ষিত হয় যার কারণ হয়তো বংশগত। সে যাই হোক বর্ণিত বদঅভ্যাস সমূহ যথাসময়ে নির্ণয় করা এবং তা নিয়ন্ত্রণে আনার মাধ্যমে খামারের লাভ অক্ষুন্ন রাখার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দশম অধ্যায়

মুরগির খামারে জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

জীব-নিরাপত্তা

ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, পরজীবি, পোকামাকড় এবং বন্যপ্রাণী ইত্যাদি খামারে পালিত মুরগির বাসস্থানে প্রবেশ বা বেঁচে থাকা এবং সংক্রমিত করা অথবা মুরগির কোনরকম বিপদগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখার সমন্বিত প্রয়াসই জীব-নিরাপত্তা।

জীব-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ

রোগ জীবাণুসমূহ পাখিদের মলমূত্র, নাক, মুখের নিঃসরণ এবং রক্তচোষা কীটসহ সাধারণত বায়ু, লিটার, পানীয় জল, খাদ্য ও খাদ্যপাত্র, শারীরিক স্পর্শ, যন্ত্রপাতি যেমন, ব্রুডার এবং বাসা, কাপড় চোপড়, কীটপতঙ্গ, বন্যপাখি, কুকুর, বিড়াল, বন্যপ্রাণী, ডিম বহনকারী ট্রে ও যানবাহন এবং মাংস বিক্রেতা, ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ছড়ায়।

জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

জীব-নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে খামারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থান নির্বাচনের সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হল ঃ

ক) খামারটি যেন লোকালয়ের মাঝে না হয় অর্থাৎ ১০০ মিটারের দূরত্বের মধ্যে হাঁস,কবুতর বা অন্য প্রাণী বিচরণ না করে।

খ) খামারটির আধা কিলোমিটারের মধ্যে মুরগির বাজার, সদর রাস্তা বা হাঁস মুরগি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প না থাকে।

গ) খামারটির চারিদিকে পর্যাপ্ত খোলামেলা স্থান থাকতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত আলো,বায়ু চলাচল করতে পারে।

ঘ) জলাশয় বা পুকুর যেখানে অতিথি পাখি বা জলজ হাঁস বিচরণ করে এমন স্থানের নিকটে খামার স্থাপন করা যাবে না।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার এবং খামার মালিকেরা পরিচ্ছন্নতা নিয়মাবলীর রক্ষক হতে পারেন। দর্শনার্থীরা খুব অল্প অসুবিধার কারণ সৃষ্টি করতে পারে যদি উক্ত ব্যক্তিগণ দর্শনার্থীদের সঠিক নিয়মাবলী মেনে চলতে বা মানার ব্যবস্থা না করেন। বিশেষ করে যদি কোন দর্শনার্থী মুরগির শেডে প্রবেশ করতে চান তবে খামারের জন্য নির্দিষ্ট জুতা ও কাপড় পরে জীবাণুনাশক দ্রবনে হাত-পা ধুয়ে খামারে প্রবেশ করবেন। এক সেডের কর্মচারী অন্য শেডে বা ফার্মে যেতে পারবে না।

খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা

১) শুধুমাত্র প্রথম দিন কাগজের ওপর খাবার সরবরাহ করা যাবে। দ্বিতীয় দিন থেকে খাবারের পাত্রে খাবার সরবরাহ করতে হবে।

২) খাবার এবং পানির পাত্রে মুরগি যাতে পায়খানা করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। মুরগির উচ্চতা অনুযায়ী পাত্র ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিতে হবে বা উঁচু করে দিতে হবে। খাবার এবং পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

৩) মাইকোটক্সিনমুক্ত খাবার মুরগিকে সরবরাহ করতে হবে।

৪) প্রস্তুতকৃত খাদ্য যেন গুণগতমানসম্পন্ন ও সুষম হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই খাদ্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভালভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

নিয়মিত পরিষ্কারকরণ

মুরগি খামারের শ্রমিকরা প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং হাত-পা জীবাণুমুক্ত করে পোল্ট্রি শেডে প্রবেশ করবে। তারা অসুস্থ্য এবং মৃত মুরগি দ্রুত সরিয়ে ফেলবে এবং মুরগির বিষ্ঠাও প্রতিদিন পরিষ্কার করবে। খামারের আশেপাশের মাটি ৩/৪ মাস পরপর উলটপালট করে দিতে হবে, অথবা ঐ সকল স্থানে নতুন মাটি ফেলতে হবে। এর ফলে খামার এলাকায় জীবাণুর চাপ কম থাকবে।

অযাচিত প্রাণী

খাদ্য এবং অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইঁদুর, বিড়াল, ছুঁচো ইত্যাদি প্রাণীর বসবাসের জন্য খুবই উপযোগী এবং প্রজননের স্থান। এ সমস্ত প্রাণী তাদের মলমূত্রাদির মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে। সেজন্য অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলতে হবে।

পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ

পোকামাকড় রোগের উৎস হিসাবে এবং পরজীবির বাহন অথবা অন্যান্য রোগের জীবাণুবহনকারী হিসাবে কাজ করে। পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য মুরগি সরানোর পর মেঝে, লিটার, বেঁড়া ও ঘরের ভিতরে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। কয়েকদিন এভাবে রেখে দেওয়ার পর লিটার সরিয়ে ঘর ভালভাবে পরিষ্কার করে পুনরায় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

মৃত মুরগি সৎকার

যখন কোন মুরগি মারা যায় তখন এর দেহাবশেষ নিজেই রোগের উৎসে পরিণত হয় এবং সঙ্গে রাখা অন্যান্য মুরগির এবং আশেপাশের পোল্ট্রি ফার্মের জন্য সংক্রমণের উৎসে পরিণত হয়।

মৃত মুরগি সৎকারের বিভিন্ন পদ্ধতি

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত মুরগি সৎকার করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন উপায়সমূহ দেয়া হলঃ-

১) **পোড়ানো** ঃ সংক্রামক জীবাণুকে ধবংস করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে পুড়িয়ে ফেলা। তবে বাণিজ্যিকভাবে ধোঁয়াবিহীন, দুর্গন্ধবিহীন পোড়ানোর চুল্লী বাজারে সহজলভ্য নয়।

২) **পুঁতে ফেলা** ঃ যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলা একটা বড় সমস্যা। পরিবেশ আইন মেনে আবর্জনা গভীর গর্তে পুঁতে ফেলাই উত্তম। এতে শিয়াল কুকুর জাতীয় প্রাণী বর্জ্যের নাগাল পাবে না।

৩) **গর্তের মাধ্যমে** ঃ সাধারণত পঁচনের জন্য ছোট গর্ত করে মৃতপাখির দেহাবশেষ ও অন্যান্য বর্জ্য নিঃস্কাশন করা যায়।

পৃথকীকরণ

অনুজীবের ছড়িয়ে পড়াকে পৃথকীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঠেকানো সম্ভব। রুগ্ন বা আক্রান্ত মুরগিকে স্বাস্থ্যকর নিরোগ মুরগি থেকে পৃথক করে রাখা উচিৎ এবং নিরোগ মুরগিকে পরিচর্যার জন্য ভিন্ন লোক নিয়োগ করা উচিৎ। রুগ্ন মুরগিকে খামার থেকে ছাঁটাই করে ফেলতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। কারণ এইসব রুগ্ন মুরগি আরোগ্য লাভ করলেও দীর্ঘসময় ধরে জীবাণুর বাহক হিসাবে কাজ করতে পারে।

টীকা প্রদান

মুরগিকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করার জন্য টীকা দেয়া অত্যাবশ্যক। সঠিক পদ্ধতিতে টীকা প্রদানের মাধ্যমে মুরগিকে প্রধান প্রধান সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

একাদশ অধ্যায়

মুরগির ভ্যাক্সিন ও তার ব্যবহার

ভ্যাক্সিন বা টীকা

ভ্যাক্সিন বা টীকা একধরণের উপাদান যা প্রাণীর শরীরে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতকৃত। ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে শরীরে নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে। যেমন- রাণীক্ষেত রোগের জন্য আরডিভি একটি ভ্যাক্সিন। ভ্যাক্সিন প্রধানত তিন প্রকার হয়ে থাকে -

(১) লাইভ ভ্যাক্সিন বা জীবিত টীকা

(২) কিল্ড ভ্যাক্সিন বা মৃত টীকা

(৩) রিকম্বিন্যান্ড ভ্যাক্সিন

ভ্যাক্সিন প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রাণীর শরীরে নির্দিষ্ট সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ এন্টিবডি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করা, ফলে মুরগি আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই প্রতিরোধ করতে পারে।

ভ্যাক্সিনেশনের সাধারণ নিয়মাবলীঃ

ভ্যাক্সিন প্রয়োগের সময় নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অবশ্যই মানতে হবে ঃ

১। খামার এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাবের উপর ভিত্তি করে ভেটেরিনারীয়ানের সহায়তায় একটি ভ্যাক্সিনেশন সূচী তৈরী করতে হবে।

২। খ্যাতিসম্পন্ন প্রস্তুতকারক এর ভ্যাক্সিন সংগ্রহ করতে হবে।

৩। ভ্যাক্সিন ও ডাইলুয়েন্ট উভয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়সীমা দেখে নিতে হবে। কোন অবস্থাতেই মেয়াদ উত্তীর্ণ ভ্যাক্সিন ব্যবহার করা যাবে না।

৪। ঘোলাটে ও তলানিযুক্ত ডাইলুয়েন্ট ব্যবহার করা যাবে না।

৫। দিনের ঠান্ডা আবহাওয়া যেমন-সকাল বা বিকালে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করতে হবে।

৬। পানিতে ভ্যাক্সিন ব্যবহারের সময় এন্টিবায়োটিক ও জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না এবং ভ্যাক্সিন পানিতে মিশানোর ৩-৪ ঘন্টা পূর্বে পানি খাওয়ানো বন্ধ রাখতে হবে।

৭। ভ্যাক্সিন প্রয়োগের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত হতে হবে।

৮। ভ্যাক্সিন পরিবহনের জন্য অবশ্যই বরফযুক্ত ঠান্ডা বক্স বা ফ্লাক্স ব্যবহার করতে হবে।

৯। ভ্যাক্সিন গুলানোর ১ ঘন্টার মধ্যেই ব্যবহার করা উচিৎ। অটোমেটিক সিরিঞ্জ দ্বারা ভ্যাক্সিনেশন সময় বাঁচায় ও পরিশ্রম কমায়।

১০। অভিজ্ঞ ব্যাক্তির দ্বারা সঠিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত পথে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে।

১১। ব্যবহারের পর ভ্যাক্সিনের বোতল পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

১২। সুস্থ মুরগিকে ভ্যাক্সিন দিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ ভ্যাক্সিন করার ১৪ দিন পর মুরগির সিরাম পরীক্ষা করে রোগ প্রতিরোধের মাত্রা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

ভ্যাক্সিন বা টীকা দেওয়ার পরও রোগের কারণ

নিম্নোক্ত কারণে ভ্যাক্সিন দেওয়ার পরও রোগ হতে পারে

১। রোগের জীবাণু মুরগির শরীরে আগে থেকেই সুপ্ত অবস্থায় থাকলে তা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের পর প্রতেরোধ ক্ষমতা তৈরীর পূর্বেই আক্রান্ত হতে পারে।

২। সঠিক ডোজে এবং সঠিক পথে ভ্যাক্সিন না দিলে।

৩। রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ষ্ট্রেইন ও ভ্যাক্সিন ষ্ট্রেইন একই না হলে।

৪। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে ভ্যাক্সিন নষ্ট হলে।

৫। জীবিত ভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিনের জীবাণুগুলির মৃত্যু হলে।

৬। মুরগি অপুষ্টিতে ভুগলে শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণ এন্টিবডি তৈরী করতে সক্ষম না হলে।

৭। মুরগি কৃমি, ককসিডিওসিস, মারেক্স, আফলাটক্সিন, মাইকোপ্লাজমা, এন্টারাইটিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হলে।

৮। ভ্যাক্সিন প্রয়োগের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত না হলে।

৯। অদক্ষ ব্যক্তির দ্বারা ভ্যাক্সিন করালে।

১০। খামারের পানিতে ভ্যাক্সিন মিশানোর সময় জীবাণুনাশক ব্যবহার করলে।

ভ্যাক্সিন প্রদানের পদ্ধতি

ভ্যাক্সিন প্রদানের পদ্ধতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপর ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা নির্ভরশীল। ভ্যাক্সিন প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা ভালভাবে পড়ে নিয়ে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি ভ্যাক্সিনই বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। একক বা গ্রুপ ভিত্তিক ভ্যাক্সিনেশন হতে পারে। একক ভ্যাক্সিনেশন অবশ্যই কার্যকর ভাবে ভাল, কিন্তু সময় ও খরচ এর দিক বিবেচনা করে গ্রুপ বা মাস (mass) ভ্যাক্সিনেশন বড় ফার্মের জন্য সুবিধাজনক।

(ক) একক ভ্যাক্সিনেশনের পদ্ধতি

সাবকিউটেনিয়াস বা চামড়ার নীচে অথবা ইন্ট্রামাসকুলার বা মাংসের মধ্যে ইনজেক্শন

সাধারণত ঘাড়ের চামড়ার নিচে সাবকিউটেনিয়াস ইনজেক্শন এর মাধ্যমে এবং উরু বা রানের মাংসে অথবা পিঠের মেরুদন্ডের হাড়ের সাথে মাংসে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেক্শন এর মাধ্যমে ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়। এ ধরণের ভ্যাক্সিনেশন এর সুবিধা হল প্রতিটি মুরগিই প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্যাক্সিন পেয়ে থাকে। এ ধরণের ভ্যাক্সিনেশনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মুরগিগুলো স্বাস্থ্যবান থাকে এবং ভ্যাক্সিনেশনকারী যথেষ্ট পারদর্শী হন।

চোখে বা নাকে ফোঁটার মাধ্যমে

একটি ড্রপার বরফ পানিতে ঠান্ডা করা সুতি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে ছায়াযুক্ত স্থানে বসে নাকের রাস্তায় বা চোখ খুলে এক ফোঁটা ভ্যাক্সিন দিয়ে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হয় যাতে ভ্যাক্সিনের ফোঁটাটি গড়িয়ে না পড়ে সম্পূর্ণ ভিতরে প্রবেশ করে। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি মুরগি প্রয়োজনীয় এবং সমপরিমাণ ভ্যাক্সিন পেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিন প্রয়োগকারীকে দক্ষ হতে হবে।

ঠোঁট ডুবানোর সাহায্যে

এ পদ্ধতিতে একটি পাত্রে ভ্যাক্সিন রেখে ঐ পানিতে প্রতিটি পাখির ঠোঁট এমনভাবে ডুবাতে হবে যেন নাকের ছিদ্র পর্যন্ত পানিতে ভিজে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিটি মুরগি প্রয়োজন মত ভ্যাক্সিন পাওয়ার সম্ভবনা থাকে। তবে ভ্যাক্সিনকারীকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভ্যাক্সিন মিশ্রিত পানি প্রতিটি পাখির নাকের ছিদ্র পর্যন্ত উঠে।

স্কারিফিকেসন বা ক্ষত তৈরীর মাধ্যমে

ভ্যাক্সিন মিশ্রিত সূচ-এর মাধ্যমে ক্ষত তৈরী করায় ভ্যাক্সিন রক্তের সাথে শরীরের ভিতর ঢুকে। এছাড়া উরুর ৮-১০টি পালক উঠানোর ফলে সামান্য একটা ক্ষতের মত হয় এবং ঐ ক্ষতস্থান ভ্যাক্সিন মিশ্রিত পানি দ্বারা লেপে দিলে ভ্যাক্সিনেশন হয়ে যায়। এ পদ্ধতিতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ভ্যাক্সিন শরীরের ভিতর ঢুকেছে। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অধিক পরিমাণে ক্ষত সৃষ্টি না হয় এবং বেশি পরিমাণ রক্তক্ষরণ না ঘটে।

(খ) দলগতভাবে ভ্যাক্সিন প্রদানের পদ্ধতি

যে সমস্ত মুরগিকে ভ্যাক্সিনেশন করা হবে সে গুলিকে ৩-৪ ঘন্টা কোন প্রকার পানি না দিয়ে ভ্যাক্সিন মিশ্রিত পানি সরবরাহ করতে হবে। মুরগিগুলো তৃষ্ণার্ত থাকার ফলে ভ্যাক্সিন মিশ্রিত পানি যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করবে। এই পানি ২-৩ ঘন্টা পাত্রে রাখতে হবে, ফলে সকল মুরগিই ভ্যাক্সিন পেয়ে যাবে। এ পদ্ধতিতে অনেক মুরগি একসঙ্গে ভ্যাক্সিনেশন হয়ে যায়। বড় ফার্মে এই পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্যণীয়ঃ

১) ভ্যাক্সিন সলিউশন তৈরী করতে হবে ব্যবহার এর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে।

২) সর্বদা পরিষ্কার পানি ব্যবহার করতে হবে। বিশেষভাবে ডিষ্টিল ওয়াটার ভ্যাক্সিন সলিউশন তৈরীতে ব্যবহার করতে হবে।

৩) সকালে বা বিকালে (দিনের ঠান্ডা সময়ে) ভ্যাক্সিন মিশ্রিত পানি দিতে হবে।

৪) ভ্যাক্সিন মিশ্রিত পানি দেওয়ার আগে পানির পাত্রে কোন প্রকার জীবাণুনাশক ব্যবহার করা যাবে না।

স্প্রেইং বা ছিটানোর মাধ্যমে

ভ্যাক্সিন স্প্রে মেশিন এর সাহায্যে এক মিটার উপর হতে ভ্যাক্সিনেশন করা যাবে। অনেক মুরগিকে এ পদ্ধতিতে এক সাথে ভ্যাক্সিনেশন করা যায়। বিশেষভাবে ছোট বাচ্চাকে বড় বড় ফার্মে এই পদ্ধতিতে ভ্যাক্সিনেশন করা হয়ে থাকে।

ভ্যাক্সিন সংরক্ষণ

ভ্যাক্সিনের গুণগত মান সঠিক না থাকলে অর্থাৎ ভ্যাক্সিন নিম্নমানের হলে এবং প্রয়োজনীয় টাইটার না থাকলে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করে কাজ হবে না। সাধারণত জীবাণুর ষ্ট্রেইন, টাইপ এবং ভ্যাক্সিন সংগ্রহ করার পর মুরগির দেহে প্রয়োগ করার পূর্ব পর্যন্ত ভ্যাক্সিন ও ডাইলুয়েন্ট বরফের প্যাকসহ ফ্লাক্সে বহন করতে হবে। তবে স্টোর করার প্রয়োজন হলে রেফ্রিজারেটরের নরমাল চেম্বারে রাখতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে ভ্যাক্সিন এর কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হবে। লাইভ এবং কিল্ড দুই ধরনের ভ্যাক্সিনই ২-৮ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। ডিপফ্রিজে রাখা যাবে না।

সাবধানতা

- অসুস্থ মোরগ-মুরগীকে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করলে কোন ফল হবে না। বিশেষ কারণ ব্যতিত বিভিন্ন ধরনের ভ্যাক্সিন প্রয়োগের মাঝে কম পক্ষে ৭ দিন ব্যবধান থাকা প্রয়োজন
- ভ্যাক্সিন প্রয়োগের পর খালি শিশি বা বোতল এবং অব্যবহৃত ভ্যাক্সিন যেখানে সেখানে না ফেলে মাটির নীচে পুঁতে অথবা পুঁড়িয়ে দিতে হবে, অন্যথায় ফার্মে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে
- যে সব ভ্যাক্সিন লিকুইড নাইট্রোজেন এ সংরক্ষণ করতে হয় সে গুলির ক্ষেত্রে লিকুইড নাইট্রোজেন এর লেভেল যাতে সব সময় সঠিক থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় ভ্যাক্সিন নষ্ট হবে
- ভ্যাক্সিন মিশ্রণের সময় ভায়াল রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে সাথে সাথে মিশ্রিত না করে টেবিলের উপর বা খালি অবস্থায় বেশিক্ষণ রাখলে ভ্যাক্সিনের কার্যকরী ক্ষমতা লোপ পায়
- ভ্যাক্সিন মিশ্রণের পর পাত্রটি বরফের একটি পাত্রের উপর রেখে ছায়াযুক্ত এবং ধুলোবালি মুক্ত অবস্থায় ভ্যাক্সিন

করতে হবে। অন্যথায় ভ্যাক্সিনের সঠিক ফল পাওয়া যাবে না

- ইনজেকশন পদ্ধতিতে ভ্যাক্সিন করার সময় প্রতি ১০০০টি মোরগ-মুরগী ভ্যাক্সিন করার পর সুঁচ বদল করতে হবে
- ভ্যাক্সিন গুলানোর পর সাথে সাথে ব্যবহার করতে হবে, সংরক্ষণ করা যাবে না
- কিল্ড ভ্যাক্সিন ব্যবহারের সময় ভ্যাক্সিন ফ্রিজ থেকে বের করার পর ১৫-২৫ ডিগ্রীঃ সেঃ তাপমাত্রায় আসার পর প্রয়োগ করতে হবে
- প্রয়োগের পূর্বে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে
- বোতল খোলার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভ্যাক্সিন ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা ব্যাহত হবে
- চোখে ফোঁটার মাধ্যমে ভ্যাক্সিন প্রয়োগের সময় ফোঁটা দেওয়ার পর বাচ্চাটিকে কিছু সময় ধরে রাখতে হবে এবং বাচ্চা ভ্যাক্সিনের ফোঁটাটি গিলে নিয়েছে নিশ্চিত হওয়ার পরই ছাড়তে হবে। অন্যথায় ভ্যাক্সিনের সুফল পাওয়া যাবে না
- এস.জি (সালমোনেলা গ্যালিনেরাম) ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ৭ দিন পূর্বে এবং ১৪ দিন পর পর্যন্ত কোন প্রকার এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না
- এ সব ছাড়াও সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা (খাদ্য ও বাসস্থান) সুষম খাদ্য এবং পীড়নমুক্ত অবস্থা ইত্যাদি বিষয় টীকার কার্যকারীতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে

দ্বাদশ অধ্যায়

মুরগির গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ ও তার ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন অনুজীব দ্বারা সৃষ্ট মুরগির বিভিন্ন রোগের তালিকা

সঠিক জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি ও খামার ব্যবস্থাপনার ঘাটতি থাকলে মুরগি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। মুরগি সচরাচর যে সব রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে তা নিম্নরূপঃ

ভাইরাস জনিত রোগ ঃ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, রাণীক্ষেত, গামবোরো, ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস, করাইজা ইত্যাদি।

ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ ঃ সালমোনেলোসিস, কলিব্যাসিলোসিস, মাইকোপ্লাজমোসিস ইত্যাদি।

ছত্রাক ও টক্সিন জনিত রোগ ঃ ব্রুডার নিওমোনিয়া, আফলা টক্সিকোসিস, অকরা টক্সিকোসিস

পরজীবি জনিত রোগ ঃ এসকারিওসিস, কক্সিডিওসিস বা রক্তআমাশয়

মুরগির সাধারণ রোগসমূহের কারণ, লক্ষণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা -

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ এটি এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-এ ভাইরাস জনিত মারাত্নক সংক্রামক ও প্রাণঘাতি রোগ। মৃত্যু ও রোগ ছড়ানোর হার শতভাগ।

লক্ষণ

- হঠাৎ মৃত্যুহার অত্যাধিক আকার ধারণ করে
- মাথার ঝুঁটি ও ওয়াটেল কালচে বর্ণ ধারণ করে
- শ্বাসনালী সহ প্রায় সমস্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গে রক্তক্ষরণ দেখা যায়

প্রাথমিক চিকিৎসা

- ইমিউনোমডিলেটর ও ভিটামিন-সি, স্যালাইন দেওয়া যেতে পারে

রাণীক্ষেতঃ এটি নিউক্যাসেল ডিজিজ ভাইরাস ঘটিত মারাত্নক সংক্রামক রোগ। সব বয়সের মুরগিই আক্রান্ত হতে পারে এবং মৃত্যু হার প্রায় শতভাগ।

লক্ষণ

- সবুজ পায়খানা করে
- ঘাড় বাঁকা করে ঝিঁমায়
- প্রোভেনট্রিকুলাস ও ট্রাকিয়ায় রক্তক্ষরণ হয়

প্রাথমিক চিকিৎসা

- রাণীক্ষেতের ভ্যাক্সিন প্রয়োগ ও টাইটার পরীক্ষার মাধ্যমে ভ্যাক্সিন সিডিউল তৈরী করে টীকা প্রয়োগ করতে হবে

গামবোরোঃ অল্প বয়সের বাচ্চাতে মারাত্নক মহামারী আকার ধারণ করে। গামবোরো ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত হয়।

লক্ষণ

- পাতলা পায়খানা
- হাঁটা-চলা বন্ধ করে বসে বসে ঝিঁমায়
- রানের মাংসে রক্তক্ষরণ

প্রাথমিক চিকিৎসা

- খামার এলাকায় উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব জেনে ভ্যাক্সিন সিডিউল তৈরী করা
- আক্রান্ত মুরগিকে ভিটামিন-সি, স্যালাইন, ও গুড়ের পানি খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়

ইনফেকশাস ব্রংকাইটিসঃ এটি ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত মারাত্নক সংক্রামক রোগ। প্রায় সকল বয়সের মুরগি আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ

- নাক দিয়ে সর্দি ঝরে
- শ্বাস নিতে কষ্ট হয়
- পুরো ট্রাকিয়ায় শ্লেষা জমে এবং এয়ার স্যাক ঘোলাটে হয়
- কিডনি ফুলে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- নিয়মিত টীকা প্রদান
- স্পেকটোরেন্ট জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ

ব্রুডার নিউমোনিয়াঃ এসপারজিলা নামক ছত্রাকের সংক্রামণের ফলে ব্রুডিং বয়সের বাচ্চায় দেখা যায়। সাধারণত অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত কাঠের গুড়ার লিটার ব্যবহারে এর প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।

লক্ষণ

- বাচ্চা হা করে শ্বাস নেয়
- ফুসফুসে সাদা দানা দেখা যায়

প্রাথমিক চিকিৎসা

- ঘরে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা
- লিটার হিসাবে কাঠের গুড়ার পরিবর্তে পরিষ্কার শুকনো ধানের তুষ ব্যবহার করা

কলিব্যাসিলোসিসঃ এটি ই-কোলাই নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত রোগ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও অনিরাপদ খাবার পানি এবং হ্যাচারীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- বাচ্চার নাভি শুকাতে বিলম্ব হওয়া
- ব্রুডিং বয়সে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাওয়া

প্রাথমিক চিকিৎসা

- পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানি ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা
- ব্রুডিং এর তাপমাত্রা পর্যাপ্ত করণ
- ভেটেরিনারীয়ানের পরামর্শে সঠিক এন্টিবায়োটিক পূর্ণ মেয়াদে ব্যবহার করা

কক্সিডিয়োসিসঃ আইমেরিয়া নামক প্রটোজোয়া দ্বারা সংঘটিত অল্প বয়সের মুরগির মারাত্নক রোগ।

লক্ষণ

- রক্ত পায়খানা করে

প্রাথমিক চিকিৎসা

- ভিটামিন-কে জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা
- এন্টি কক্সিডিওসিস ঔষধ ও স্যালাইন প্রয়োগ করা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মুরগির প্রজনন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর পদ্ধতি

মুরগির প্রজনন

দেশী মুরগির প্রজনন সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। যেমনঃ ফ্লক প্রজনন. পেন প্রজনন ও কৃত্রিম প্রজনন।

ফ্লক প্রজনন ঃ এই পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণ মোরগ-মুরগীর মধ্যে প্রজনন ঘটানো হয়। এই পদ্ধতিতে ডিমের উর্বরতা বেশি হয় এবং মুরগীর প্রজননে মুরগীর পছন্দ থাকতে পারে। সাধারণতঃ ৮-১০ টি মুরগীর সাথে ১ টি মোরগ দিয়ে প্রজনন করানো হয়।

পেন প্রজনন ঃ এই প্রজননে একটি পেনে কিছু মুরগীকে মাত্র একটি মোরগের সঙ্গে প্রজনন করানো হয়। ফলে কোন মুরগী যদি ঐ মোরগকে পছন্দ না করে তবে সেই মুরগী ঐ মোরগের সঙ্গে প্রজনন নাও ঘটাতে পারে। ফলে অধিক পরিমাণে উর্বর ডিম পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কৃত্রিম প্রজনন ঃ এই পদ্ধিতিতে মোরগ থেকে সিমেন সংগ্রহ করে মুরগীর প্রজনন অংগে ইনসেমিনেশন করা হয়। বর্তমানে যেখানে খাঁচায় মুরগী পালন করা হয় সেখানে এই পদ্ধতিতে প্রজনন করানো হয়। তা ছাড়া গবেষণার কাজে এই পদ্ধতিতে প্রজনন করানো হয়।

উর্বর ডিম উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

ডিম পাড়ার পর থেকে ইনকুবেটরে সেট করা পর্যন্ত উর্বর ডিমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না হলে ডিমের হ্যাচিবিলিটি হ্রাস পায়। তাই উর্বর ডিম উৎপাদনের সময় নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য্য।

ডিম পাড়া বাসার বিছানা ঃ মুরগী ডিম পাড়া বাসায় ডিম পাড়ার সময় হঠাৎ ডিম ভেঙ্গে যায়। তাই বিছানা দ্রব্য নরম হতে হবে। বিছানা দ্রব্য এমন হতে হবে যাতে সহজে পরিষ্কার করা যায়।

ডিম পাড়া বাসা পরিস্কার ঃ অনেক সময় দেখা যায় ডিম পাড়া বাসার উপর মুরগী পায়খানা করে থাকে। যদি পায়খানা ডিম পাড়ার আগে পরিষ্কার করা না হয়, তবে মুরগী পায়ে পায়খানা লাগিয়ে ডিম পাড়তে যাবে এবং ডিম নোংরা হবে। ডিম জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে।

লিটার পরিস্কার ঃ ডিম পাড়া মুরগীর ঘরে লিটার ভিজা থাকলে মুরগীর পায়ে বুট সৃষ্টি হবে এবং পা নোংরা থাকবে এবং ডিম পাড়তে গেলে ডিম নোংরা হবে।

ডিম সংগ্রহ ঃ উর্বর ডিম সাধারণত দিনে ৪ বার সংগ্রহ করা হয়। উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ৫-৬ বারও সংগ্রহ করা হয়। ডিম পাড়ার সময় ডিম বাসায় থাকলে মুরগী যখন ডিম পাড়তে বাসায় যায় তখন কিছু সময় ডিমের উপর বসে থাকে। ফলে হ্যাচাবিলিটি হ্রাস পায় এবং বাচ্চার গুণগত মান হ্রাস পায়।

রাত্রিতে ডিম পাড়ার বাসা বন্ধ রাখা ঃ অনেক মুরগী ডিম পাড়া শেষে বাসায় বসে থাকতে পছন্দ করে। ফলে পায়খানা করে বাসা নোংরা করে। তাই দিনের শেষে ডিম পাড়া শেষ হলে ডিম পাড়া বাসা বন্ধ করা প্রয়োজন এবং সকালে ডিম পাড়া শুরুর আগে খুলে দেয়া প্রয়োজন।

ডিম সংগ্রহের ট্রে ঃ ডিম সংগ্রহের ট্রে পরিষ্কার হতে হবে এবং ট্রে সহজে পরিষ্কার করা যায় এমন হতে হবে।

দ্রুত বাছাই করা ঃ উর্বর ডিম দ্রুত বাছাই করে হ্যাচিং উপযোগী ডিম এবং অনুপযোগী ডিম পৃথক করে হ্যাচিং ডিম গুলো জীবাণু মুক্ত করতে হবে।

মোরগ-মুরগীর অনুপাত ঃ মেঝেতে মুরগি পালন করতে ৮-১০ টি মুরগীর জন্য ১ টি মোরগ দিতে হয়। কৃত্রিম প্রজননে ১ টি মোরগ থেকে সংগৃহীত সিমেন দ্বারা ৫-৬ টি মুরগীকে ইনসেমিনেশন করা যায়।

বাচ্চা ফুটানো ডিমের বৈশিষ্ট্য

ডিম বাছাই করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয় -

ডিমের আকার ঃ ডিমের আকারের উপর বাচ্চারআকার এবং ডিম ফুটার হারের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অস্বাভাবিক বড় বা ছোট ডিম বাচ্চা ফুটানোর উপযুক্ত নয়। সাধারণত ৪০-৫০ গ্রাম ওজনের দেশী মুরগীর ডিম বাচ্চা ফুটানোর জন্য ভাল।

ডিমের খোসার রং ঃ ডিমের খোসার রং জাতের উপর নির্ভর করে। তাই হ্যাচিং ডিম বাছাইয়ের সময় নির্দিষ্ট জাতের রং এর ডিম বাছাই করা দরকার। অন্য রং এর ডিম বাদ দেয়া প্রয়োজন। অন্য রং এর ডিম কম ফুটে। দেশী মুরগীর ডিম সাধারণত ক্রিম বা হালকা বাদামী রং এর হয়।

ডিমের খোসার মসৃণতা ঃ ডিমের খোসা যত মসৃণ হবে ডিম তত ভাল ফুটে। অমসৃণ বা খসখসে খোসার ডিম বাছাই করে বাদ দেওয়া উচিত।

ফাটা ডিম ঃ ফাটা ডিম অবশ্যই ফুটানোর জন্য বাছাই করা উচিত হবে না। কারণ ফাটা ডিম ফুটবে না এবং বসানোর সময় ভেঙ্গে অন্য ডিম নষ্ট করবে।

নোংরা ডিম ঃ নোংরা ডিম জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত থাকে। ফলে ভ্রুণ মরে যায়। মেঝেতে পাড়া ডিমে নোংরা থাকলে তা জীবাণু নাশক দ্বারা ধৌত করে দিতে হবে।

ডিমের ভিতরের গুণাগুণ ঃ ক্যান্ডলিং এর সময় ডিমের ভেতরে যদি রক্তের ছিটা, ঘোলাটে বা বায়ু বুদবুদ ঘুরতে দেখা যায় তবে সে সকল ডিম বাদ দিতে হবে।

ডিমের গঠন ঃ ডিমের গঠন একদিকে মোটা, একদিকে চিকন এই প্রকার ডিম বাছাই করতে হবে। আঁকাবাঁকা বা দুই দিকে সমান বা এবরো থেবরো ডিম বাছাই করা যাবে না।

বাচ্চা ফুটানো ডিমের যত্ন

ডিম সংগ্রহ ঃ উর্বর ডিম সাধারণত দিনে ৪ বার সংগ্রহ করা হয়। উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ৫-৬ বার ও সংগ্রহ করা হয়। বেশি সময় ডিম বাসায় থাকলে মুরগী যখন ডিম পাড়তে বাসায় যায় তখন কিছু সময় ডিমের উপর বসে থাকে। ফলে হ্যাচাবিলিটি হ্রাস পায় এবং বাচ্চার গুণগত মান হ্রাস পায়।

ফিউমিগেশন ঃ ডিম বাছাই করার পর দ্রুত ফিউমিগেশন চেম্বার দিয়ে ডিমের খোসার রোগ জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ফিউমিগেশনের সময় ২০ মিনিটের অধিক হবে না।

ডিম পরিষ্কার করা ঃ পরিষ্কার ডিম মাটি লাগানো ডিমের চেয়ে বেশি ফুটে। কাজেই দ্রুত ডিম স্যান্ড পেপার বা মোটা কাপড়ের সাহায্যে পরিষ্কার করা দরকার।

পরিবহন/স্থানান্তর ঃ হ্যাচারী থেকে মুরগীর ফার্ম দূরে হলে ট্রাকে ডিম স্থানান্তরের সময় তাপমাত্রা ১৮° সেঃ এবং আর্দ্রতা ৭০-৮০% রাখা প্রয়োজন।

হ্যাচিং ডিম জীবাণুমুক্তকরণ

মুরগী ডিম পাড়ার পর খোসার উপর জীবাণু পাওয়া যায়। তাদের কিছু প্যাথোজেনিক এবং কিছু ননপ্যাথোজেনিক। ডিম পাড়ার পরই ৩০০-৫০০ জীবাণু খোসায় পাওয়া যায়। এর ১৫ মিনিট পর ১৫০০-৩০০০ জীবাণু এবং ১ ঘন্টা পর ২০,০০০-৩০,০০০ জীবাণু পাওয়া যায়। সে জন্য ডিম পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুমুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। যত দেরি করা হবে কিছু কিছু জীবাণু ডিমের খোসার ছিদ্র দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে তা মুক্ত করা সম্ভব নয়। তাই যত শীঘ্রই সম্ভব ডিম সংগ্রহ করেই জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ডিম জীবাণুমুক্ত করা যায়। যেমনঃ-

কোয়াটারনারী এ্যামোনিয়া ঃ ইহা পানির সাঙ্গে ২০০ পিপিএম অনুপাতে মিশিয়ে ডিমের উপর স্প্রে করতে হবে।

ফরমালডিহাইড গ্যাস ঃ ফরমালডিহাইড গ্যাস দ্বারা ডিমকে একটি চেম্বারে বা রুমের ভিতর রেখে ফিউমিগেশন করে জীবাণুমুক্ত করা হয়। ১০০ ঘনফুট জায়গায় নরমাল ফিউমিগেশনের একটি হিসাবঃ ২০ গ্রাম পটাশিয়াম দানা ও ৪০ গ্রাম ফরমালিন (৪০%)।

বাচ্চা ফুটানো ও খাওয়ার ডিম সংরক্ষণ

বাচ্চা ফুটানোর ডিম সংরক্ষণ ঃ মুরগী ডিম পাড়ার পর বাছাই করে জীবাণুমুক্ত করে মেশিনে বসানোর আগে ভ্রুণ বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য সঠিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় দ্রুত সংরক্ষণ করা দরকার।

তাপমাত্রা ঃ সাধারণত ০-৪ দিন পর্যন্ত মেশিনে বাসানোর পূর্বে সংরক্ষণ করতে হলে ১৭-১৮° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। এর চেয়ে বেশি দিন থাকলে তাপমাত্রা আরও কমিয়ে ১৫° সেঃ এ সংরক্ষণ করতে হবে।

আর্দ্রতা ঃ ডিম সংরক্ষণ রুমের আর্দ্রতা কমে গেলে ডিমের খোসার ছিদ্র দিয়ে জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হয়ে শুকিয়ে যায়। অপরদিকে আর্দ্রতা বেশি হলে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে মোল্ড বা ছত্রাক জন্মাতে পারে। তাই ডিম সংরক্ষণ রুমের সঠিক আর্দ্রতা হলো ৭৫-৮০% যাতে ডিমের কোন ক্ষতি না হয়।

উর্বর ডিম সংরক্ষণের একটি হিসাব নিম্নরূপ -

মজুদ সময়	০-৪ দিন	৫-৭ দিন	৮-১৪ দিন
তাপমাত্রা	১৭-১৮° সেঃ	১৬-১৭° সেঃ	১৪-১৬° সেঃ
আর্দ্রতা	৮০%	৮৫%	৮৫%
ডিমের পজিশন	মোটা দিক উপরে	মোটা দিক উপরে	মোটা দিক নিচে

খাওয়ার ডিম সংরক্ষণ ঃ দৈনিক বাজারজাতকরণে চাহিদার অধিক ডিম উৎপাদিত হলে বা বছরের বিভিন্ন সময়ে যখন বাজারে ডিমের দাম কম থাকে, তখন ডিম সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ডিম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণত পোল্ট্রি ব্যবসায়ীরা দুটি পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ করে থাকেন। যেমনঃ বাড়িতে ডিম সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ। পদ্ধতি দুটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলোঃ

বাড়িতে ডিম সংরক্ষণ

ওয়াটার গ্লাস পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে ৬ মাস পর্যন্ত ডিম সংরক্ষণ করা যায়। যখন ডিমের উৎপাদন অধিক থাকে তখন সতর্কতার সাথে শুধু মাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অধৌত এবং কোন রকম ফাটা বা ভাঁঙ্গা ব্যতীত সুষম ডিম সংরক্ষণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। সোডিয়াম সিলিকেট বা ওয়াটার গ্লাস যখন পানিতে দ্রবণ তৈরী করে তখন অতি শক্তিশালী প্রবাহ প্রতিরোধী আঠালো দ্রবণে পরিণত হয়। যখন ডিমকে এই দ্রবণে ডুবানো হয় তখন ডিমের গায়ের চারিদিকে একটি সিলিকার আবরণ তৈরী হয়, যা ডিমের খোসার ছিদ্র গুলোকে বন্ধ করে দেয়, ফলে ডিম বায়ু রোধী হয়। এভাবে ডিম সংরক্ষণ করা যায়। সাধারণতঃ ১০ লিটার পানিতে ১ কেজি পরিমাণ সোডিয়াম সিলিকেট মিশিয়ে একটি রডের সাহায্যে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে দ্রবণটি তৈরী করা হয়। ১০ লিটার দ্রবণের সাহায্যে ১৫ ডজন ডিমকে সংরক্ষণ করা যায়।

লাইম ওয়াটার পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে ৬ মাসের মত ডিম সংরক্ষণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে ২০ লিটার পানিতে ১ কেজি পরিমাণ চুনাপাথর বা চুন একটি এনামেল বা কাঁচের পাত্রে নিয়ে একটি রডের সাহায্যে নাড়িয়ে চাড়িয়ে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরী করতে হবে, অতপরঃ ১০ মিনিট সময় রেখে দিতে হবে তলানি পড়ার জন্য। তারপর চুনের পানির দ্রবণ হতে উপরিস্থ চুনের পানি আলতোভাবে অন্য একটি পাত্রে ঢেলে নিতে হবে। এই পানিতেই ডিম সংরক্ষণ করা যাবে। তলানি কখনই ডিম সংরক্ষণে ব্যবহৃত হবে না।

তৈল প্রতিরোধীকরণ পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে ডিমকে ঈষদ উষ্ণ তেলে ডুবানো হয়। সাধারণভাবে নারিকেল তেলই বেশি ব্যবহৃত হয়। নারিকেল তেলকে অবশ্যই রঙ বিহীন, স্বাদ বিহীন এবং সুগন্ধ যুক্ত বৈশিষ্ট্যের হতে হবে। ডিম পাড়ার পর পরই একে তৈলাক্ত করা উচিত। তেল দ্বারা খোসার ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়, ফলে জলীয় বাষ্পের

আদান-প্রদান এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড হারানো বন্ধ হয়। ফলে ডিমের গুণাগুণ রক্ষা করা যায় এবং ওজন হারানো প্রতিরোধ করা যায়।

থার্মোস্ট্যাবিলাইজেশন পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ডিমকে তাপ প্রদানের মাধ্যমে ডিমের গুণাগুণ অপরিবর্তিত রাখা যায়। ডিমকে এক্ষেত্রে ৫৪.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৫ মিনিট বা ৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩-৫ মিনিট পানিতে নাড়ানীর মাধ্যমে উত্তপ্ত করণের মাধ্যমে থার্মোস্ট্যাবিলাইজেশন সম্পন্ন করা হয়। এই পদ্ধতির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ

- ডিমের খোসায় যেসব ব্যাকটেরিয়া রয়েছে সেগুলি মারা যায়
- যে গুলো উবর্র সেগুলোর ভ্রুণ মারা যায়
- সংরক্ষণের গুণগত মান উন্নত হয়

বাণিজ্যিক পদ্ধিতিতে ডিম সংরক্ষণ

অধিক পরিমাণ ডিম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়। সংরক্ষণের কার্যটি বিভিন্নভাবে করা যায় ঃ

হিমাগারে ডিম সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ সাধারণতঃ ডিম সংরক্ষণাগার কক্ষের তাপমাত্রা +০.৫ ডিগ্রী থেকে -০.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৫-৮৫% রক্ষা করা হয়। কারণ অধিক আর্দ্রতা মোল্ড বৃদ্ধির জন্য উপযোগী।

ফ্রোজেন এগ্স সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ বর্তমানে উন্নত দেশে ডিমের আভ্যন্তরীণ অংশ হিমায়িতকরণ সংরক্ষণের একটি সাধারণ পদ্ধতি। প্রথমে ডিমকে ক্যান্ডেলিং করা হয়। অতপরঃ ডিম ভেঙ্গে দেখা হয় তাতে কোন খারাপ গন্ধ বা অস্বাভাবিকতা বিরাজ করছে কিনা। এক্ষেত্রে কুসুম এবং ডিমের সাদা অংশ পৃথক ভাবে ৫% গ্লিসারিন দ্বারা আলাদা ভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় কুসুম এবং ডিমের সাদা অংশ ৩০-৪০ পাউন্ডের টিনে ভরে নিম্ন তাপমাত্রায় ১০-৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা শূন্য তাপমাত্রার নিচে ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে সংরক্ষণ করলে ১২ মাস বা তারও বেশি সময় পর্যন্ত ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

ড্রাইড এগ্স সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ উন্নত দেশে এই পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ ব্যাপকভাবে করা হয়। যদিও পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল তথাপি কিছু সুবিধা রয়েছে যেমনঃ পরিবহন ব্যয় কমায় এবং হিমাগারে ডিম সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। এই প্রক্রিয়ায় কুসুম, ডিমের সাদা অংশ বা সম্পূর্ণ ডিমকে ১৬০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় শুষ্ক করে পাউডারে পরিণত করা হয় এবং ৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করা হয়।

ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো পদ্ধতি

ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর দুইটি পদ্ধতি আছে। যেমনঃ দেশীয় পদ্ধতি এবং কৃত্রিম পদ্ধতি।

ক) দেশীয় পদ্ধতিতে ডিম ফুটানো ঃ এই পদ্ধতিতে কুঁচে মুরগীর সাহায্যে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো হয়ে থাকে।

কুঁচে মুরগীর বৈশিষ্ট্যঃ মুরগীটি স্বাস্থ্যবান, শান্ত, ডিমে বসে এবং মুরগীর আকার বড় হতে হবে। মুরগীটি ডিমে বসে কিনা সেজন্য কিছু অনুর্বর ডিম দিয়ে পরীক্ষা করা দরকার। মুরগী তা দেয়ার জন্য বসানোর আগে কৃমি ও উকুন মুক্ত করে নিতে হবে।

ডিম বসানো বাসার বৈশিষ্ট্য ঃ একটি বাঁশ বা কাঠের তৈরী বাসার ভিতর শুকনা পরিষ্কার ঘাস বা খড় ছোট ছোট করে কেটে দিতে হবে এবং বাসাটা নিরাপদ এবং আরামদায়ক স্থানে রাখতে হবে।

ডিম ফুটানো ব্যবস্থাপনা ঃ মুরগীর আকারের উপর নির্ভর করে ১০-১৫ টি ডিম একটি মুরগীর নিচে বসাতে হবে। কুঁচে মুরগী প্রতিদিন কমপক্ষে ২ বার খাদ্য ও পানি খেতে বের হবে। অত্যাধিক গরমের সময় যদি আর্দ্রতা কমে যায় তবে কিছু পানি ডিমে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

খ) কৃত্রিম পদ্ধতিতে ডিম ফুটানো ঃ এই পদ্ধতিতে ইনকুবেটর মেশিনের সাহায্যে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো হয়ে থাকে। প্রথমে যেখানে ডিম বসানো হয় তাকে সেটার বলে। সেটারে ১৮ দিন ডিম থাকে। ১৮ দিন পর ডিম স্থানান্তর করে অপর একটি মেশিনে বসানো হয়। তাকে হ্যাচার বলে। হ্যাচারে শেষের তিন দিন ডিম থাকে। এখান থেকে বাচ্চা বের হয়।

কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা ফুটানোর ক্ষেত্রে চারটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বিবেচনা করা হয়।

* তাপমাত্রা

* আর্দ্রতা

* ভেনটিলেশন

* টার্নিং

তাপমাত্রা ঃ বর্তমানে অত্যাধুনিক মেশিনগুলো সবই অটোমেটিক। এগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ইনকুবেটর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ (Recomendation) অনুযায়ী। সুপারিশ অনুযায়ী সেট করে দিলে অটোমেটিক চলতে থাকে। সঠিক তাপমাত্রা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রুণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ইনকুবেটরে আদর্শ তাপমাত্রা ০-১৮ দিন পর্যন্ত ৯৯.০° ফারেনহাইট এবং ১৯-২১ দিন পর্যন্ত ৯৮.৬৬° ফাঃ।

আর্দ্রতা ঃ ডিমের খোসার মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দিয়ে ডিমের জলীয় অংশ বের হতে থাকে। ইনকুবেটর এর ভিতরের আর্দ্রতা কমে গেলে ডিমের ভিতর বাচ্চা শুকিয়ে যায়। তাই ইনকুবেটরের ভিতর ৬৫-৭০% আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয় যা ভ্রুণ বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

ভেনটিলেশন ঃ প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীর জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। বাতাসে ২১% অক্সিজেন থাকে। ইনকুবেটরে উল্লেখিত পরিমাণ অক্সিজেন থাকা অপরিহার্য্য। বাতাসে ০.৫% কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে যা সহ্য করার মত। তাই ইনকুবেটর ভেনটিলেশনের মাধ্যমে উল্লেখিত পরিমাণ অক্সিজেন পূরণ করে এবং অতিরিক্ত কার্বন-ডাই অক্সাইড বের করে। তাই ভেনটিলেশন অত্যাবশ্যক।

টার্নিং ঃ টার্নিং হলো ডিম নাড়া চাড়া করা। ইনকুবেটরে ডিম ৪৫° কোণে থাকে। এই ডিমকে টার্নিং করে বিপরীত দিকে ৪৫° কোণে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। প্রতি ১-২ ঘন্টা পর পর টার্নিং করা প্রয়োজন।

চর্তুদশ অধ্যায়

রেশন তৈরীকরণ

দেশী মুরগির খামারে শক্তি এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমৃদ্ধ উপাদান থাকতে হবে যাতে মুরগির স্বাস্থ্য, মাংস এবং ডিম উৎপাদন দক্ষতা বাড়ে। মুরগির যেসব মূল উপাদান দরকার তা হলো পানি, শক্তি, প্রোটিন, ভিটামিন ও খণিজসমূহ। এই সব উপাদানগুলো অবশ্যই মুরগির খাদ্যে থাকতে হবে। উপরোক্ত উপাদানগুলির মান এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। কাঁচামালের গুণগত মান এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগত মান কমে যায়। উপরোক্ত বিষয়গুলো যদি সঠিক না হয় তাহলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে উৎপাদন দক্ষতা কমতে থাকে।

ভাল মানের খাবার তৈরীর ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে -

- কাঁচামালের সহজলভ্যতা এবং দাম
- খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান
- খাদ্যের পরিপাচ্যতা এবং সুস্বাদুতা
- মুরগির বয়স এবং এর উৎপাদন
- খাদ্য উপাদানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
- বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারের মাত্রা বা পরিমাণ
- রেশন তৈরীর ক্ষেত্রে খাদ্য উপাদান বিবেচনা
- খাদ্য অবশ্যই ফাংগাস বা আফলাটক্সিন মুক্ত হতে হবে
- খাদ্য বা খাদ্য উপাদানসমূহ যেন কোন অবস্থাতেই চাকা বা দলা পেকে না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে
- খাদ্যের আর্দ্রতা ১২% এর বেশি হওয়া উচিত নয় এবং এটি অবশ্যই দূর্গন্ধমুক্ত ও পোকামুক্ত হতে হবে

খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে ফিডের ল্যাব টেস্টের রিপোর্ট। মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিডের প্রক্সিমেট এনালাইসিস, ভিটামিন, মিনারেল, এমাইনো এসিডের টেস্ট করা দরকার।

খাদ্য ক্রয়কালীন সতর্কতা

নিম্নলিখিত সতর্কতাগুলো অনুসরণ করা হলে খামারী লাভবান হবেন এবং ফিডের মান বৃদ্ধি পাবে।

- ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স, লাইসিন, মিথিওনিন, ফিড গ্রেড মেডিসিন ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাগের গায়ে লিখিত ব্যবহারকালীন সময় দেখে নিতে হবে
- প্রস্তুতকৃত খাদ্য এবং খাদ্য উপাদানসমূহ ১ মাস বা তার বেশি হলে ক্রয় না করাই উত্তম
- প্রতিটি খাদ্য বা খাদ্য উপাদানসমূহের নিজস্ব রং, গন্ধ ও আকার থাকে এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে খাদ্য ক্রয় করতে হবে

পোল্ট্রি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানসমূহ ঃ

শক্তি প্রদানকারী খাদ্য

গম	ভূট্টা
চালের কুড়া	চাল ভাঙ্গা
গমের ভূষি	মোলাসিস/চিটাগুড়

প্রোটিন/আমিষ সরবরাহকারী খাদ্য

ফিস মিল	প্রোটিন কনসেনট্রেট	তিলের খৈল
ব্লাড মিল		সরিষার খৈল
মিট মিল	সয়াবিন মিল	সূর্যমুখীর খৈল
চিংড়ির উপজাত	হ্যাচারীর উপজাত	তুলার বীজ
রেশম পোকা	ফেদার মিল	বাদামের খৈল

খণিজ পদার্থ সরবরাহকারী খাদ্য

বোন মিল	ঝিনুক	ডিমের খোসার চূর্ণ
লবণ	লাইমষ্টোন	
ক্যালসিয়াম কার্বনেট	ক্যালসিয়াম ফসফেট	

উপরোক্ত খাদ্য উপাদান দিয়ে পুষ্টিমান বিবেচনা করে ফর্মূলা অনুযায়ী রেশন প্রস্তুত করা যায় অথবা রেডিফিড ক্রয় করেও মুরগিকে খাওয়ানো যায় ।

সারণী- ৮ দেশী মুরগির বাচ্চার (০-৮ সপ্তাহ) জন্য রেশন তৈরী তালিকা

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
ভূট্টা	৫৩.০
চালের কূড়া	৮.০
সয়াবিন মিল	১৭.০
গমের ভূষি	৮.৫
প্রোটিন কনসনট্রেট	১০.০
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫
লবণ	০.৫
মোট	১০০

সারণী- ৯ দেশী মুরগির বাড়ন্ত বাচ্চার (৯-১৬ সপ্তাহ) জন্য রেশন তৈরী তালিকা

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
ভূট্টা	৫৬.০
চালের কূড়া	১৩.০
সয়াবিন মিল	৯.৫০
গমের ভূষি	৯.৫০
সরিষার খৈল	৮.৮০
লাইম স্টোন	১.৪০
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৮০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০
লাইসিন	০.১০
মিথিওনিন	০.১০
লবণ	০.৫০
মোট	**১০০**

সারণী- ১০ দেশী ডিমপাড়া মুরগীর (১৭-৭২ সপ্তাহ) জন্য রেশন তৈরী তালিকা

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
ভূট্টা	৪৬.৫
চালের কূড়া	১৪.৫০
গমের ভূষি	৭.০৫
সয়াবিন মিল	১৪.৯০
প্রোটিন কনসনট্রেট	৭.৬০
ঝিনুকের গুড়া	৭.০০
ডিসিপি	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫
লাইসিন	০.১
মিথিউনিন	০.১
লবণ	০.৫
মোট	**১০০**

পঞ্চদশ অধ্যায়

দেশী মুরগি খামারের আয়-ব্যয় হিসাব

৮ টি দেশী মুরগি পালনে আয়-ব্যয় হিসাব

ক্র. নং	খরচের খাত	টাকা
ব্যয়ঃ		
ক)	**স্থায়ী খরচ ঃ**	
	১। (৫ ফুট X ৩.৫ ফুট X ৪ ফুট) মাপের নাইট সেল্টার ও ৫ ফুট X ৩ ফুট X ৪ ফুট মাপের ক্রীপ ফিডার তৈরীতে (কাঁঠ, বাঁশ, নেট, পলিথিন ও মজুরি)	৫,০০০.০০
	২। ১ টি খাদ্য পাত্র, ১ টি পানির পাত্র ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ সহ	১,০০০.০০
	মোট	৬,০০০.০০
	আবর্তিত/ চলতি খরচ ঃ	
	১। ৮ টি উন্নত জাতের বাড়ন্ত মুরগির ক্রয় মূল্য @১০০ টাকা প্রতিটি	৮০০.০০
	২। বড় মুরগির খাদ্য খরচঃ ৮ টি মুরগি দৈনিক ৬০ গ্রাম করে ৩৬৫ দিনের বাড়তি খাদ্যের পরিমাণ (৪৮০ গ্রাম X ৩৬৫)=১৭৫ কেজি X @৩৫ টাকা প্রতি কেজি	৬,০০০.০০
	৩। বাচ্চার খাদ্য খরচঃ ৬ টি মুরগী থেকে গড়ে বছরে ১৫০ টি ডিম হিসেবে (১৫০ X ৬)=৯০০ টি ডিম হয়। অর্ধেক ডিম বিক্রয় করবে এবং অর্ধেক ডিম সারা বছর ব্যাপী মুরগীর নিচে দিয়ে ধাপে ধাপে ফুটাবে। ৪৫০ টি ডিম থেকে ৭৫% বাচ্চা ফুটলে মোট বাচ্চা হবে ৩৩৮ টি, বাচ্চা গুলিকে ৮ সপ্তাহ লালন পালনের খরচঃ সর্বোচ্চ ৩% মৃত্যু ধরে মোট বাচ্চা ৩২৮ টি (৩২৮ X ৮ সপ্তাহ প্রতি বাচ্চার খাদ্য ১.৭৫ কেজি) = ৫৭৫ কেজি X @৩৫ প্রতি কেজি	২০,০০০.০০
	৪। ভ্যাক্সিন ও ঔষধ খরচ	১,০০০.০০
	৫। অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ	৩,০০০.০০
	মোট	৩০,৮০০.০০
	সর্বমোট ব্যয় ঃ	
	ক) স্থায়ী খরচ (৬০০০ টাকায় নির্মিত ঘর ও আসবাবপত্র গড়ে ৬ বছর টেকসই হলে প্রতি বছরের স্থায়ী খরচ)	১,০০০.০০
	খ) প্রতিবছর মোট চলতি খরচ	৩০,৮০০.০০
	বছরে সর্বমোট ব্যয় (ক)	৩১,৮০০.০০

	আয়	
খ)	ডিম বিক্রয় ঃ ৪৫০ টি ডিম X @ ১০ টাকা প্রতি পিস	৪,৫০০.০০
	মুরগি বিক্রয়ঃ সারা বছরে ৩২৮ টি বাচ্চা ৮ সপ্তাহে গড় ওজন ৭০০ গ্রাম হলে মোট ওজন ৩২৮ X ০.৭০০=২২৯.৬ কেজি বা ২৩০ কেজি X ৩০০ টাকা প্রতি কেজি	৬৯,০০০.০০
	৮ টি বড় মুরগির বিক্রয়মূল্যঃ ২ টি বড় মোরগ=১৫০০/- ৩৩০০ বা ৩০০০ টাকা ৬ টি বড় মুরগী=১৮০০/-	৩,০০০.০০
	বছরে সর্বমোট আয় (খ)	৭৬,৫০০.০০
	বছরে নীট মুনাফা (খ-ক)	৪৪,৭০০.০০

মন্তব্য ঃ নিজে খাদ্য তৈরী করে খাওয়ালে ও বাজার দর ৩৫০/৪০০ টাকা হলে নীট আয় বৃদ্ধি পাবে এবং গড়ে প্রতি মাসে ৪০০০/- টাকা আয় করা সম্ভব।

১০০০ টি দেশী মুরগি পালনে আয়-ব্যয় হিসাব

ক্র. নং	খরচের খাত	টাকা
ব্যয়ঃ		
ক)	স্থায়ী খরচ ঃ ১। (৬০ ফুট X ১৫ ফুট)= ৯০০ বর্গ ফুট ঘরের নির্মাণ খরচ (কাঁঠ, বাঁশ, টিন, পলিথিন ও মজুরি) ২। খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, মগ, বালতি, হোভার বিদ্যুৎ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ সহ	৮০,০০০.০০ ৫,০০০.০০
	মোট	৮৫,০০০.০০
	আবর্তিত/ চলতি খরচ ঃ	
	১। ১০০০টি উন্নত জাতের দেশী মুরগির বাচ্চার ক্রয় মূল্য @৩০টাকা প্রতিটি ২। খাদ্য খরচঃ ৮ সপ্তাহে প্রতি মুরগিতে ১.৭৫ কেজি খাদ্য X ৩৫ টাকা কেজি হিসেবে (১৭৫০কেজি X ৩৫.০০) ৩। ভ্যাক্সিন ও ঔষধ খরচ ৪। বিদ্যুৎ খরচ ৫। অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ	৩০,০০০.০০ ৬১,০০০.০০ ২,০০০.০০ ২,০০০.০০ ৫,০০০.০০
	মোট খরচ	১,০০,০০০.০০

	সর্বমোট ব্যয় ঃ	
	ক) স্থায়ী খরচ (নির্মিত ঘর ও আসবাবপত্র গড়ে ১০ বছর টেকসই হলে প্রতি বছরের স্থায়ী খরচ ৮৫০০০/১০	৮,৫০০.০০
	বছরে সর্বমোট ব্যয় (ক)	**১,০৮,৫০০.০০**

	আয়	
খ)	২% হারে মৃত্যু হলে, বিক্রয়যোগ্য মোট মুরগি ৯৮০ টি গড়ে ৮ সপ্তাহে ৭০০ গ্রাম ওজন হলে, মোট ওজন ৯৮০ X .৭ কেজি = ৬৮৬ কেজি X @৩০০ টাকা প্রতি কেজি	২,০৫,৮০০.০০
	মোট আয়	**২,০৫,৮০০.০০**
	নীট মুনাফা (খ-ক)	**৯৭,৩০০.০০**

মন্তব্য ঃ নিজে খাদ্য তৈরী করে খাওয়ালে ও বিক্রিতে বাজার দর ভাল পেলে লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার উপরে হবে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১